বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

(২য় সংস্করণ)

Buddha & Buddhism
in the eye of
Swami Vivekananda



বুদ্ধের সংকল্প

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক্! ত্বক্-অস্থি-মাংস লয়প্রাপ্ত হউক্! বহুকল্পেও দুর্লভ বোধিপ্রাপ্ত না হইয়া, এই আসন হইতে শরীর বিচলিত হইবে না। —(ললিতবিস্তর। পরিশিষ্ট ৬৬পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার

গ্রন্থকার ও প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার
৮৯, অশোক রোড, গাঙ্গুলীবাগান
গড়িয়া, কলিকাতা-৮৪

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৩
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

মুদ্রক : শ্রীহীরালাল দাস
তারা প্রেস
১০০ অরবিন্দ সরণী
কলিকাতা—৬

প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
ফোন : ৩১-১৪৭৯

Firma KLM (P) Ltd.
257B, B. B. Ganguli St. Cal-12
Phone : 27-4391

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৪-১২০৮

নিউ শরৎ প্রকাশন
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
ফোন ৩৪-৬৩৪৩

ভূমিকা

ডক্টর নিমাইসাধন বসু—অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধর্মীয় ইতিহাসে বুদ্ধদেবের ভূমিকা এবং ঐতিহাসিক অবদান সম্বন্ধে স্বামীজী গভীরভাবে অধ্যয়ন, চিন্তা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি বহুল-প্রচলিত ধারণা হ'ল যে, বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করলেও কালক্রমে এই ধর্ম এদেশ থেকে প্রায় অবলুপ্ত হ'য়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারণার পিছনে অবশ্যই যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পটভূমিতে যে সব উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন তা পাঠ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব, উভয় ধর্মের দর্শন, সামাজিক আদর্শ এবং লক্ষ্য এমনই অন্তর্ব্যাপ্ত যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পরিপূর্ণ অধ্যয়ন—উপলব্ধি সম্ভব নয়। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর অনন্য মননশীলতা ও গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামীজী শুধুমাত্র বৌদ্ধদর্শন ও সামাজিক দৃষ্টির দ্বারাই প্রভাবিত হননি, বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও সংগঠনের দৃষ্টান্তও তাঁকে প্রভাবিত ক'রেছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠার মূলেও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধসঙ্ঘ ও সংগঠনের প্রভাব কাজ ক'রেছিল ব'লে মনে করার কারণ আছে। আর একটি কথাও আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন, মনন ও কর্মযজ্ঞের পিছনে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর যে সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মমত ও ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে তাঁর যে সশ্রদ্ধ আগ্রহ ছিল, তার মূলেও ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা।

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার গভীর শ্রম, নিষ্ঠা, ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মূলত এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর

বক্তব্যের সঙ্কলন হলেও, লেখকের সুচিন্তিত এবং সুস্পষ্ট অভিমত গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাই গ্রন্থটির জনসমাদরের প্রমাণ। বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে শ্রীসরকার 'বুদ্ধের আবির্ভাবকাল ও উহার তাৎপর্য' সম্বন্ধে একটি বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা ক'রে গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। এই জটিল বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে-সব যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তা বিশেষ মূল্যবান। আমি আশাকরি প্রথম সংস্করণের মতো গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণও সমাদৃত হবে এবং বিবেকানন্দচর্চা সম্বন্ধে অন্যদের উৎসাহিত করবে।

নিমাইসাধন বসু

গ্রন্থকারের বক্তব্য

কয়েকবৎসর পূর্বে, Complete works of Swami Vivekananda, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, এবং অন্য দুই-একখানি গ্রন্থ হইতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মবিষয়ক (এবং আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয়েও কিছু-কিছু) স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলিকে সংকলিত, সম্ভবমতো সংক্ষিপ্ত ও আলোচ্যবিষয়ানুযায়ী ২৮টি ভাগে ভাগ করিয়া যে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, এই বইখানি উহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। পূর্বের ন্যায় এবারেও, বহুসংখ্যক পাদটীকা ও অনুরূপ বচনাদিসহায়ে বুদ্ধের বাণী ও স্বামীজীর উক্তিগুলিকে সহজ-বোধ্য করিয়া তুলিবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, স্থানবিশেষে স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতাংশকে একত্রিত, কোথায়ও বা স্বতন্ত্রভাবে উহাদের অনুবাদ করিয়া লইতে হওয়ায়, গ্রন্থখানিতে বক্তৃতার স্থান ও কালের নির্দেশ ভিন্ন, অধিকাংশক্ষেত্রেই বাণী ও রচনার কোনো reference দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এবারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ৭ম ও ১০ম পৃষ্ঠায় স্বামীজীর কিছু-কিছু স্বল্প-পরিচিত উক্তি বা বাণীর উল্লেখ ও গ্রন্থশেষে 'বুদ্ধের আবির্ভাবকাল ও উহার তাৎপর্য' শীর্ষক ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টটির সংযোজন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অতঃপর গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য বা সময়োপযোগীতার কথায় প্রথমেই উল্লেখ্য,—কেন যে একদিন ভারতের পক্ষে বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল সে-সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিটি "ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধি পায়, পিতৃপুরুষের ধর্মে অন্ধবিশ্বাস যখন প্রবল হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তিদ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলিতে থাকে, তখন একটি পরিবর্তনের [একান্ত] প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেননা, ঐ সকলের দ্বারা মানুষের [ইষ্টের পরিবর্তে] অনিষ্টই বাড়িতে থাকে; উহাদের শোধন ছাড়া মানুষের কল্যাণ হয়না।" (১২-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, আড়াই হাজার বছরেরও বেশী আগেকার অবস্থা সম্বন্ধে কথা হইলেও, বর্তমান সময় বা সমাজের পক্ষেও কথাগুলি সমভাবেই প্রযোজ্য। বরং বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর সত্ত্বেও, তখনকার তুলনায় ধর্মকর্মের অবস্থা এখন আরও বেশী জটিল—

আরও বেশী অন্তঃসারশূন্য ও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—'ধর্ম মানে ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরলাভের উপায়মাত্র' ; অর্থাৎ **'Means to an end and not an end in itself'** এবং সেই জন্যই ধর্মের যে আসল লক্ষ্য উহা ছাড়িয়া, মত ও পথ লইয়াই মারামারি-কাটাকাটি করিয়া মরিতেছি ! **'The fruits have gone to the ditch and we are quarrelling over the basket'** ! কাজেই এদিক দিয়া দেখিলে, অন্য যে-কোনো সময়ের অপেক্ষা, মত ও পথ-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই যে এখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থে, বুদ্ধ তথা স্বামী বিবেকানন্দের উদার, অসাম্প্রদায়িক ও আত্মজ্ঞান—আত্মতত্ত্বমূলক বাণী বা উক্তিসকলকে অধিকতরভাবে জানা, গভীরতর-ভাবে বুঝা, এবং ব্যাপকভাবে কার্যে প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, একথা বোধহয় অনস্বীকার্য।

এবারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটি কথা লইয়াও কিছু-একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া কোনো একদিন স্বামীজীকে যেমন বলিতে শুনা যায়—'আমি বুদ্ধের দাসানুদাস-গণের দাস' গ্রন্থখানির প্রারম্ভেই উহার উল্লেখ করিতে গিয়া আমাদিগকে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে-স্বামীজীকে একদিন স্তব করিতে শুনা যায়—'দাস আমি জনমে-জনমে দয়ানিধে !' বলিয়া, সেই তাঁহাকেই অন্যদিন নিজেকে 'বুদ্ধের দাস' নয়, একেবারে 'দাসানুদাসগণের দাস' বলিয়া বলিতে শুনিলে, কে-ই বা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে ? এসত্ত্বেও কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলেই দেখা যায়, বিস্ময়ের কথা হইলেও, কথাটি যে আদপে মিথ্যা বা সাময়িক ভাবোচ্ছাসমাত্র নয়, তার প্রমাণ—বুদ্ধসম্বন্ধে স্বামীজিরই অন্যান্য দিনের অনুরূপভাবেরই কিছু-কিছু উক্তি, যেমন—"ভগবান বুদ্ধ আমার ইষ্ট—আমার ঈশ্বর। তিনি কোন ঈশ্বরবাদ প্রচার করেন নাই—তিনি নিজেই ঈশ্বর, একথা আমি পরিপূর্ণভাবেই বিশ্বাস করি।"........"আমি যদি বুদ্ধের হৃদয়বত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একাংশেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।" ...."তিনি হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, হয়তো-বা করিতেন না, তাহাতে আমার পক্ষে কিছু আসিয়া যায়না। অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে

পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তিনি তাহাই লাভ করিয়াছিলেন"। "মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন—'ভাল কাজ কর, এবং ভাল হও। ইহাই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে, এবং সত্য বলিতে যাহা কিছু আছে উহাতেই পৌঁছাইয়া দিবে।' "বাস্তবিকই, তিনিই ছিলেন আদর্শকর্মযোগী, যিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়াই সকল কাজ করিয়াছেন। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায় যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"····ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে বইখানির ৭ম পৃষ্ঠা হইতে উল্লেখ্য স্বামীজীর উক্তিটি—"তখনই কেবল আমরা আমাদের সর্বোচ্চ—সর্বোত্তম অবস্থা লাভে সক্ষম হইব, যখন আমাদের কাছে অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ধরিবার মতো কেহ থাকিবে না—আমাদের পাপের জন্য দায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কোন শয়তানকে খুঁজিতে হইবেনা—ভারবহন করিবার নিমিত্ত কোন ঈশ্বরেরও প্রয়োজন হইবেনা····" ইত্যাদি। বুদ্ধচরিত্রের মধ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত এই 'সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম' অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াই, মনে হয়, বুদ্ধসম্বন্ধে এত করিয়া বলিতে শুনা যায় স্বামীজীকে। অন্যপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়, যে-দৃষ্টিতে স্বামীজী বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন, সেই অভিন্ন দৃষ্টিতেই তিনি দেখিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকেও, এবং সেইজন্যই তাঁহার নিকটেও অনুরূপ দাস্যভক্তির প্রার্থনা। তবে ইহা সত্ত্বেও যদি কোন পার্থক্যবোধ থাকিয়া থাকে, তবে উহা সেই একই সত্তার যুগভেদে প্রকাশভেদ সম্বন্ধেই মনে করিতে হয়।

যাহা হোক, বেশী আর কথা না বাড়াইয়া, বক্তব্যটি শেষ করিবার পূর্বে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সেই সব মনীষীদের কথা যাঁহারা বইখানির প্রথম সংস্করণ উপলক্ষ্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শুভেচ্ছাদ্বারা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক ডঃ নিমাইসাধন বসু মহাশয়কে তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার এবং এবারের সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটির জন্য।

বিনীত—

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার

নির্দেশিকা

বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

(২য় সংস্করণ)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মতো কেহ কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নাই,—আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সাধু হইয়াও একটি ছাগশিশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত! এত প্রেম যে, এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য স্বীয় শরীর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন [দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন]; এবং আশ্রয়দাতা এক চণ্ডালের জন্য আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন! আর আমার বাল্যকালে একদিন তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, এবং আমি তাঁহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলাম। কারণ, আমি জানিয়াছিলাম যে, ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং আসিয়াছেন। (Notes of Some Wanderings With Swami Vivekananda—(স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে)—ভগিনী নিবেদিতা)।

নিজের মতকে শাস্ত্রসম্মত ব'লে প্রমাণ করতে গিয়ে, আচার্য শঙ্করকেও সময়-সময় কূটতর্কের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। বুদ্ধ কিন্তু অন্য সকল ধর্মাচার্যের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন। তিনি ব'লে গেছেন—'কোনো শাস্ত্রে বিশ্বাস ক'র না। বেদ একটি ধোঁকাবাজী মাত্র। (১) যদি আমার সাথে কোথায়ও কোনো শাস্ত্রের মিল দেখা যায়, তবে উহা শাস্ত্রের পক্ষেই ভাল কথা! আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। যাগযজ্ঞ, দেবোপাসনা বৃথা (১)। বুদ্ধই প্রথম ব্যক্তি যিনি জগৎকে

---

(১) বেদের কর্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়াই কথাগুলি বলা হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। তুলনীয় গীতার উক্তিও—'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।' ইত্যাদি—'হে পার্থ! অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকাণ্ডের

পূর্ণাঙ্গ-নীতিশিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ভালথাকার জন্যই ভাল থাক্‌তেন, ভালবাসার জন্যই ভালবাস্‌তেন (অর্থাৎ উহার পশ্চাতে কোনরূপ স্বার্থপরতা কিংবা অভিসন্ধি ছিল না)। (Inspired Talks—সহস্রদ্বীপোদ্যান, আমেরিকা—১৮৯৫)।

বুদ্ধ কখনও কারও কাছে মাথা নত করেন নি—বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত অথবা সামাজিক প্রথা—কারও কাছে নয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চল্‌তে পারে, ততদূর পর্যন্ত তিনি নির্ভীকভাবে যুক্তিবিচার ক'রে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, প্রাণীমাত্রের প্রতিই এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি।.........নিজের জন্য তিনি কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা কর্‌তেন না। (ঐ—ঐ)।

ভগবান বুদ্ধ আমার ইষ্ট—আমার ঈশ্বর। তিনি কোন ঈশ্বরবাদ প্রচার করেন নাই,—তিনি নিজেই ঈশ্বর, একথা আমি পরিপূর্ণভাবেই

স্বর্গফলাদি-প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত। তাহারা বলে—বেদোক্ত কাম্যকর্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কোনো ধর্ম নাই; তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ; তাহারা ভোগৈশ্বর্যলাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাতমনোহর বেদবাক্য বলিয়া থাকে। এই সকল-বাক্যদ্বারা-অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্যে-আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্যাকার্য নির্ণায়ক বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়না।' (২/৪২-৪৪)।

'ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা' ইত্যাদি—'ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদিপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোমরস পানে নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গলাভ কামনা করেন।' 'তাঁহারা পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দেবভোগসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন।' (৯/২০)। —'তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে, কামনাভোগ-পরবশ ব্যক্তিগণ যাগযজ্ঞাদি বেদোক্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকরিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে থাকেন।' (৯/২১)। 'অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ —'অল্পবুদ্ধি দেবোপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, (কিন্তু) আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন (৭/২৩)।

বিশ্বাস করি। (স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত পত্র—১৮৯০)।

স্মরণীয়—'প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু আমরা ধারণাই করিতে পারিনা, কারণ ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ'। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৪/১০৫ পৃঃ।)

আমি যদি বুদ্ধের হৃদয়বত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একাংশেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।·········তিনি হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, হয়তো-বা করিতেন না, তাহাতে আমার পক্ষে কিছু আসিয়া যায় না। অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে-পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তিনি তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কোনো ধর্মমতে বিশ্বাস বা আস্থাস্থাপন করিলেই পূর্ণতালাভ হয় না। নিষ্কামকর্মের ফলেই পূর্ণতালাভ হইয়া থাকে। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৯০০)। (২)

পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস ল'ন নাই। সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন্, একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি, এস। তোমরা সকলেই প্রবেশ কর (৩)। (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা)।

---

(২) স্বামীজীর মতে, এরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্তিরই অন্য নাম ঈশ্বরলাভ বা ঈশ্বরদর্শন। অন্যকথায়, এরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বয়ংই ঈশ্বরস্বরূপ হইয়া যান। কাজেই ইঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না-করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

(৩) কথাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে বলিতে হয়, যাঁর দেহাত্মবুদ্ধি নাই; যিনি সত্য-সত্যই নিজেকে একটি অবস্থাবিশেষমাত্র,—তত্ত্বস্বরূপ, কিংবা কোনো-একজন পথ-প্রদর্শকরূপে মনে করিতে সমর্থ, তাঁর পক্ষে কখনও অপরের নিকট হইতে 'পূজা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা' থাকিতে পারেনা।' স্মরণীয় স্বামীজীর নিজের উক্তিটি—'I want to be a voice without a form' অর্থাৎ এইরূপ নৈর্ব্যক্তিকতা বা তত্ত্বস্বরূপতালাভই তাঁহার কাম্য বা জীবনের উদ্দেশ্য।

বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার(৪)। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবী করেন নাই। নিজের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

দার্শনিক মত ও ধর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, পরার্থে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র মানবজাতি সসম্ভ্রমে ও ভক্তিভরে দণ্ডায়মান হয়।....তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া একজন খ্রীষ্টানও যখন এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলোক' (Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাযুক্ত হন—যে-বুদ্ধ আদৌ ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, আত্মত্যাগ ভিন্ন, আরকিছুই প্রচার করেন নাই ?....নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর। (ঐ—১৮৯৩)।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর মধ্যে সেই কথাগুলি তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে,—কেমন করিয়া তিনি উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে, অধঃ উর্ধ্বে—সর্বত্র প্রেমের চিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যতক্ষণ-না সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সেই সুমহান ও অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যখন তোমাদের মধ্যেও সেইভাব আসিবে, তখনই তোমরা যথার্থ ব্যক্তি বলিতে যাহা বোঝায় উহা লাভ করিবে। (লণ্ডনে বক্তৃতা—১৮৯৬)।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের অন্য একটি বক্তৃতায় বর্তমান সময়ের নীতিবাদ ও লোককল্যাণের কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলিতে শোনা যায়—আমার ইচ্ছা গৌতমবুদ্ধের মতো আরও কিছু-কিছু নীতি পরায়ণ

---

(৪) হিন্দুপুরাণের দৃষ্টিতে বুদ্ধকে অবতার বলা চলে কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ যিনি বেদ মানেন নাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই, তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিতে যাওয়াটা বোধহয় অর্থহীন, যদিও পরবর্তী কালে আসিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজে বুদ্ধকে সেইভাবেই স্থান পাইতে দেখা যায়। তবে, অন্যত্র গীতাপ্রসঙ্গে কোনএকটি বক্তৃতায় স্বামীজীকে যেমন বলিতে শুনা যায়— প্রত্যেক অবতারই, তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ'—সেদিক দিয়া যদি কেহ বুদ্ধকে 'অবতার' কেন, 'অবতার বরিষ্ঠ' বা 'শ্রেষ্ঠ অবতার' বলিতে চান, তাহাতেই বা আপত্তি কী থাকিতে পারে?

ব্যক্তির দর্শনলাভ করি। তিনি কোন ব্যক্তি-ঈশ্বরে অথবা আত্মায় বিশ্বাসবান ছিলেন না; সে-সব লইয়া কখনও মাথাও ঘামান নাই। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদী। কিন্তু উহা সত্ত্বেও, যে-কোন কাহারও জন্যই অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সারাজীবন ধরিয়াই তিনি সকলের হিতের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন—সকলের হিতচিন্তা ছাড়া তাঁর আর অন্য চিন্তাই কিছু ছিলনা। তাঁর জন্মের বর্ণনা করিতে গিয়া জীবনচরিতকার সত্যই বলিয়াছেন—বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপেই তাঁর জন্ম হ'য়েছিল। নিজের মুক্তিকামনায় ধ্যানচিন্তা করিতে তিনি বনগমন করেন নাই। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন—এ-সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ। ইহা হইতে পরিত্রাণের পথ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন?—ইহাই ছিল তাঁর সারাজীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন (৫)। তোমরা কি মনে কর আমরা কেহই বুদ্ধের মতো নীতি-পরায়ণ হইতে পারিয়াছি?

তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও তেমনি মহৎ ছিল।······[কোনো একটি হীনজাতীয় লোকের নিকট হইতে অখাদ্য-খাদ্য গ্রহণের ফলে মৃত্যুর পূর্বে] তিনি শিষ্যদের ব'লেছিলেন 'তোমরা এ-খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি ইহা প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা। লোকটির কাছে গিয়ে বোলো —'আমার জীবনে সে এক মহৎ কর্তব্য ক'রেছে। আমাকে সে দেহমুক্ত ক'রে দিয়েছে'। [মৃত্যুকালে] জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে, তিনি

(৫) এইরূপ 'বহুজন হিতায়—বহুজন সুখায়' কথাটি স্বামীজীর নিজের জীবনেরও একটি মূলমন্ত্র ছিল। জগতের দুঃখকষ্ট স্বামীজীকেও কিরূপ ব্যথিত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ 'Conversations and Dialogues' (স্বামী-শিষ্যসংবাদ) হইতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের সহিত স্বামীজীর কথোপকথনের একাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—'আমার কি মনে হয় জান G. C.? জগতের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য যদি আমাকে হাজারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত। এতে যদি একজনেরও দুঃখের কিছুটা লাঘব হয়, তা হোক, তাতেও আমি রাজী।'

তিরস্কারক'রে ব'লেছিলেন—'একী! আমার এত উপদেশের এই ফল? কোনো মিথ্যাবন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার উপরও কিছুমাত্র নির্ভর ক'রো না। এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথাগৌরবের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ কোনো ব্যক্তি নন্, তিনি উপলব্ধিস্বরূপ (৬)। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর'। এমন কি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠা দাবী করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৯০০)।

আদর্শ-কর্মযোগী

প্রতিদানে কোনকিছুর আশা না রাখিয়া, কেবল জগতের হিতের জন্যই আমরা যে-সকল সৎচিন্তা করি, উহার প্রতিটিই সঞ্চিত হইয়া থাকিবে—আমাদের বন্ধনশৃঙ্খলের এক-একটি শিকলি চূর্ণ করিবে—আমাদিগকে ক্রমশঃ পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিয়া তুলিবে, যতদিন-না আমরা পবিত্রতম মানবে পরিণত হই।........তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু-একটু বলিতে চাই, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি হলেন বুদ্ধদেব। একমাত্র তিনিই ইহা সর্বোতভাবে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধব্যতীত জগতের সকল মহাপুরুষই বাহ্যপ্রেরণাবশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।...এক শ্রেণী বলেন, তাঁহারা 'ঈশ্বরের অবতার'.... অপরশ্রেণী বলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের 'প্রেরিত বার্তাবহমাত্র'; উভয়কেই তাঁহাদের প্রেরণাশক্তি বাহির হইতে লাভ করিতে দেখা যায়।.... মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে

(৬) তুলনীয়—শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম-উক্তিটি—"যে-রাম, সে-ই কৃষ্ণ, ইদানীং এই খোলে (নিজ শরীর দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ।' —অর্থাৎ তিনি কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন্, তত্ত্ব বা উপলব্ধিস্বরূপ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যে-উক্তিগুলি—'জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' (৪।৯) 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ (৭।৩), একদিক দিয়ে ওদের তাৎপর্যও এইরূপই বুঝিতে হয়।

তোমাদের বিভিন্ন মতবাদের কথা জানিতে চাহি না। আত্মাসম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতবাদের বিচারেরই বা প্রয়োজন কী? ভালকাজ কর এবং [উহার ফলেই] ভাল হও। ইহাই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে, এবং সত্য বলিতে যাহা-কিছু আছে উহাতেই পৌঁছাইয়া দিবে।'.... বাস্তবিকই তিনিই ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী—যিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়াই সকল কাজ করিয়াছেন। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যতমানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ছিলেন তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব—অতুলনীয় সমাবেশ—শ্রেষ্ঠতম আত্মশক্তির বিকাশ। (ঐ—১৮৯৩) (৭)।

---

(৭) বুদ্ধের উক্তি—অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া?
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং। (ধম্মপদ—অত্তবগ্গো)।
—নিজেই তুমি নিজের উদ্ধারকর্তা। তদ্ভিন্ন উদ্ধারকর্তা আর কে আছে? আত্মজিৎ নিজের মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন।

তুলনীয় স্বামীজীর উক্তিগুলিও—'তখনই কেবল আমরা আমাদের সর্বোচ্চ—সর্বোত্তম অবস্থা লাভে সক্ষম হইব, যখন আমাদের কাছে অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ধরিবার মতো কেহ থাকিবেনা—আমাদের পাপের জন্য দায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কোনো শয়তানকে খুঁজিতে হইবেনা—ভারবহন করিবার নিমিত্ত কোন ঈশ্বরেরও প্রয়োজন হইবেনা; সব কিছুরই দায়-দায়িত্ব আমরা নিজেরাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইব'। (C/W. P. II Page 202)। 'মনুষ্য-স্বভাবের মহত্ব কখনও ভুলোনা। আমরাই অতীত ও ভবিষ্যতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 'আমিই' সেই অনন্ত মহাসমুদ্র, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ যার বুকে তরঙ্গমাত্র। তোমার নিজের অন্তরাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নত কোরোনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে 'God of Gods' (অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ বা পরমাত্মা) ব'লে জ্ঞান হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার মুক্তি নেই'। (Inspired talks America)।

গীতার বচন—উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ (৬।৫)

কর্মবাদ ও বুদ্ধচরিত্র

জগতে প্রবল ইচ্ছাশক্তিশালী যে-সকল মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচণ্ড কর্মী ও বিরাটব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাঁহারা জগৎটাকে ওলট-পালট করিয়া দিতে পারিতেন। এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহারা যুগ-যুগব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্মের দ্বারাই লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মতো প্রবল ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ হয় না। পুরুষানুক্রমিক শক্তিসঞ্চারণ (Hereditary transmission) তত্ত্বের দ্বারাও উহার মীমাংসা করা যায় না। আমরা জানি তাঁহাদের পিতারা কিরূপ ছিলেন।....যোসেফের ন্যায় লক্ষ-লক্ষ সূত্রধর জীবলীলা সংবরণ করিয়াছে। লক্ষ-লক্ষ এখনও জীবিত রহিয়াছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র রাজাও জগতে ছিলেন। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে-মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, উহা কোথা হইতে আসিল? যুগ-যুগান্তর ধরিয়াই উহার অস্তিত্ব ছিল, এবং উহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে-উঠিতে অবশেষে বুদ্ধ বা যীশুর আকারে প্রবলশক্তিরূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ঐ শক্তিতরঙ্গ এখনও প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। (ঐ—ঐ)।

পূর্ব-পূর্বজন্মকৃত কর্মসকলের শেষফল আমাদের এই বর্তমান জীবন। বৌদ্ধেরা বলেন—'এক প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্ব'লে ওঠে। প্রদীপ আলাদা, কিন্তু আলো সেই একই' (Six Lessons on Raja-Yoga in America)। ['Discontinuous continuity']।

মনের সমুদয় বহির্মুখ-শক্তি স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, ঐগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমার শক্তিবিকাশে সাহায্য করে না। ঐ গুলিকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্ধিত হইবে। ঐ সংযম হইতে মহতী ইচ্ছাশক্তির উদ্ভব হইবে; যাহা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মতো চরিত্র সৃষ্টি করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রহস্য জানে না, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৩)।

সকল যোগেরই লক্ষ্য আত্মার মুক্তি, এবং প্রত্যেক যোগই সমভাবে একই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যানের দ্বারা, খ্রীষ্ট

প্রার্থনাদ্বারা, যে-অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, মানুষ কেবল কর্মেরদ্বারাই সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে (৮)। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত। কিন্তু উভয়েই সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। (ঐ—ঐ)।

বুদ্ধের বাণী

মহাত্মা বুদ্ধ বলিয়াছেন—'শুনিবামাত্রই কোনো-কিছুতে বিশ্বাস করিওনা। বংশানুক্রমে-প্রাপ্ত বলিয়াই কোনো মতবাদে বিশ্বাস করিওনা। যেহেতু অপরে নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছে, সেইহেতু কোনকিছুতে আস্থাস্থাপন করিওনা। কোনো একজন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন বলিয়াই, কোনকিছু মানিয়া লইওনা। যে-সকল তত্ত্বের সাথে নিজেকে অভ্যাসবশে জড়াইয়া ফেলিয়াছ, তাহাতেও বিশ্বাস করিওনা। কেবল আচার্য বা গুরুবাক্যের প্রমাণবলেও কিছু মানিয়া লইওনা। বিচার-বিশ্লেষণ কর, এবং যখন ফলগুলি যুক্তির সহিত মিলিয়া যাইবে, এবং সকলের পক্ষেই হিতকারী হইবে, তখনই তাহা গ্রহণকর এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন কর' (ঐ—১৮৯৪)।

উল্লেখ্য বুদ্ধের উপদেশ—কালাম সূত্র (মহাপরিনিব্বান সুত্তং: ভূমিকা—ধর্মরত্ন মহাস্থবির) 'কোনো ধর্মীয় বা দার্শনিক মত, তাহা যত-বড় পণ্ডিতের উপদিষ্ট বা সমর্থিত হোক, যত অধিকসংখ্যক লোকের দ্বারা সম্মানিত ও আচরিত হোক, এমন কি তোমাদের পিতা-পিতামহ-পরম্পরায় প্রতিপালিত হউক না কেন, ততক্ষণ তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেনা, যতক্ষণ ঐ মত তোমার বিবেকের সহিত যাচাই করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পার নাই' (৯)।

---

(৮) এখানে নিষ্কামকর্মযোগই উদ্দিষ্ট। 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।' (গীতা ৩।১৯) —'অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্যকর্ম করিতে থাক। অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়।'

(৯) বুদ্ধের বাণী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে এখানে যাহা

কেবল অন্যের কথাই বা কেন, দেখাযায় বুদ্ধ তাঁর নিজের মতামতকে পর্যন্তও এইরূপ বিচার-বিশ্লেষণের গণ্ডী হইতে কখনও দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। এই অনন্য-সাধারণ মহত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ তাঁর নিজেরই একটি উক্তির এখানে উল্লেখ করা গেল—'ভিক্ষুগণ! তোমরা এই....পরিশুদ্ধ সুদৃষ্ট বিচারের প্রতিও আসক্ত হইও না', ইহাতে রমণ করিওনা, ইহা আমার ধন এরূপ মনে করিওনা, ইহাতে মমতা করিওনা। বরঞ্চ ভিক্ষুগণ! আমার উপদিষ্ট ধর্ম্মকে ভেলা (কুল্ল) সদৃশ মনে করিও, ইহা কেবল পার হইবার জন্য; জড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য নহে।'-বৌদ্ধদর্শন রাহুল সাংকৃত্যায়নঃ ধর্ম্মাধার মহাস্থবির।

বুদ্ধ কি বলেন শুনুন! কী প্রচণ্ড সত্যের বাণী! আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের কথা!—'তোমার অন্তর থেকে স্বার্থপরতার সকল

বলিতে শুনা যায়, উহার সহিত সম্পুর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ মনে করিয়াই বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত 'ধর্মের দাবি' শীর্ষক প্রবন্ধটি হইতে যুক্তিবিচার ও তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব অভিমতের কতকাংশও এখানে উদ্ধৃত হইল—'প্রকৃত ধর্মে অন্ধবিশ্বাসবশতঃ কোন-কিছু বিশ্বাস করা বা মানিয়া লওয়ার স্থান নাই। কোনো ধর্মপ্রচারক মহাত্মা(ই) এরূপ প্রচার করেন নাই। অধঃপতনের সময়ে(ই) ইহা আসিয়া জোটে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা কোনো-কোনো ধর্মনেতাদের অনুসরণকারী বলিয়া ভান করে, এবং তাহাদের কোনো ক্ষমতা না থাকিলেও, তাহারা মানবসমাজকে অন্ধবিশ্বাস শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে। কী বিশ্বাস করিবে তাহারা? অন্ধবিশ্বাস করার অর্থই হইল—মানবাত্মার অধঃপতন! নাস্তিক হইতে চাও তো তাই হও! কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করিবেনা। মানবের আত্মাকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া আনিবে কেন? তোমরা যে ইহাতে শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছ তাহা নহে, সমাজেরও ক্ষতি করিতেছ; এবং যাহারা তোমাদের পরে আসিবে. তাহাদের পথও বিপদসঙ্কুল করিতেছ। উঠিয়া দাঁড়াও, বিচার কর, অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্তী হইও না। ধর্মের অর্থ হইল -তদাকারকারিত হওয়া বা হইতে চেষ্টা করা, শুধু বিশ্বাস করা নহে। ইহাই ধর্ম; আর যখন তুমি সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে, তখনই ধর্মলাভ করিবে। [অর্থাৎ করিয়াছ বুঝিতে হইবে]। তার পূর্বে তুমি পশু অপেক্ষা উচ্চতর নও।'

মূল উৎপাটিত ক'রে ফেল,—যা তোমাকে স্বার্থপর ক'রে তুল্‌তে পারে এমন কোন-কিছুই যেন অবশিষ্ট না থাকে! স্ত্রী ব'ল, পুত্র ব'ল, পরিবার ব'ল—কোনকিছুরই প্রত্যাশা কোরোনা। সংসারী লোকের মতো নাহ'য়ে, পরিপূর্ণভাবে নিঃস্বার্থপর হয়ে ওঠো! সংসারী লোক মনে-মনে নিঃস্বার্থপর হ'তে চায় বটে, কিন্তু স্ত্রীর মুখপানে চাইলেই, অমনি সে স্বার্থপর হ'য়ে পড়ে। মা মনে করেন—তিনি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হ'য়েই কাজ কর্‌বেন, কিন্তু বাচ্চাটিকে দেখামাত্রই তাঁর মনে স্বার্থপরতা এসে উপস্থিত হয়। এ জগতের সবকিছুর সম্বন্ধেই এই একই কথা। মনে স্বার্থপরতার উদয় হওয়ামাত্রই—স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন-কিছু কর্‌তে যাওয়া মাত্রই, মানুষের সমগ্র মানবীয়-সত্তা—তার মধ্যকার সত্যমানুষটি অন্তর্হিত হ'য়ে যায়; আর তার স্থলে সে হ'য়ে দাঁড়ায় পশুতুল্য—একজন ক্রীতদাস মাত্র! নিজের সঙ্গী-সাথীকে পর্যন্তও ভুলে যায় সে। তাকে আর বল্‌তে শোনা যায়না—'তোমার কথাই প্রথম, আমার কথা পরে'। তার পরিবর্তে সে বল্‌তে শুরু ক'রে দেয়—'আমার স্বার্থই আগে, অন্যসকলে যে-যা পারে করুক্!' (১০)। (ঐ—১৯০০)।

সর্বভূতে প্রেম ও বৌদ্ধধর্ম

তাওবাদী, কংফুছমতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরতুষ্ট-শিষ্যগণ সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায় এই মহৎ নীতি প্রচার ক'রেছেন—'তুমি অপরের কাছথেকে যেরূপ ব্যবহার আশা কর,

(১০) তুলনীয় স্বামীজীর নিজের বক্তব্যটি—'স্বার্থপরতাই মানুষের মধ্যে মূর্তিমান-শয়তান। স্বার্থের কণামাত্রও-এর প্রতিটি কণাই শয়তান-তুল্য। যেমন-যেমন অন্তর থেকে আমিত্বের ভাব স'রে যাবে, অম্‌নি সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘট্‌বে। [বস্তুতঃ, এই 'আমিত্বে'র ভাব হইতেই স্বার্থপরতার উদ্ভব]। যখন আমিত্ব একেবারেই চ'লে যাবে, তখন একমাত্র ঈশ্বরই থাক্‌বেন। আলো ও অন্ধকার কখনও একসঙ্গে থাকতে পারেনা।' (১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কথিত)।

অপরের প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর'। কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এর ব্যাখা দিয়েছেন....মানুষ অপর-সকলকে অবশ্য ভালবাসবে, তার কারণ—সেই অপর-সকলে যে সে-নিজেই! সেই এক-বস্তুই র'য়েছেন কিনা!...জগতে যত বড়-বড় ধর্মাচার্য হ'য়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল লাওৎসে, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন—'তোমার শত্রুদেরও উপকার করো, যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাসো' (১১)।....(Inspired Talks—আমেরিকা)। [যীশুর উক্তি—'সৎ ও অসৎ উভয়ের জন্যই তাঁর (ঈশ্বরের) সৃষ্ট সূর্য উদিত হয়, ন্যায়বান ও অধর্মাচারী উভয়ের উপরেই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যারা তোমাদের ভালবাসে তোমরা যদি শুধু তাদেরই ভালবাস, তাহলে ঈশ্বরের কাছে তোমরা কী পুরস্কার আশা করতে পার? কর-আদায়কারীরাও তো তাই ক'রে থাকে। তোমরা যদি শুধু তোমাদের ভাই-বন্ধুদেরই অভিনন্দন জানাও, তাহলে তোমরা অন্যদের চেয়ে বেশী কি করলে? বিজাতীয়েরাও তো তাই ক'রে থাকে।']

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকেও মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে-ব্যক্তি তাঁর প্রতি গভীর দ্বেষবশতঃ সর্বদা তাঁরই চিন্তা করত, যার ফলে তার চিত্তশুদ্ধি হ'য়েছিল এবং সে মুক্তিলাভের যোগ্য হ'য়ে উঠেছিল (১২)। অতএব সর্বদাই ঈশ্বরচিন্তা করো: ওতেই তোমাদের পবিত্র ক'রে তুলবে। (ঐ—ঐ)।

কেন বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল?

ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধিপায়, পিতৃপুরুষের ধর্মে অন্ধবিশ্বাস যখন প্রবল হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তিদ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলিতে

(১১) 'নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ-কুদাচনং, অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মোসনন্তনো'। শত্রুতাদ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয়না, মিত্রতাদ্বারাই শত্রুতার উপশম হইয়া থাকে—ইহাই সনাতন ধর্ম।—ধম্মপদ : যমকবগ্‌গো।

(১২) ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শত্রুভাবে ভজনের দ্বারাও মুক্তিলাভের যে-সকল কাহিনী, উহাদেরই একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলিতে হয়।

থাকে, তখন একটি পরিবর্তনের [একান্ত] প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেননা ঐ সকলের দ্বারা মানুষের অনিষ্টই বাড়িতে থাকে; উহাদের শোধন ছাড়া মানুষের কল্যাণ হয় না (১৩)। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

[বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে] ভারতে যে আদিম জড়বাদ প্রচলিত ছিল যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হইত—'খাও-দাও, মজা কর' ঈশ্বর আত্মা বা স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই; ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত পুরোহিতের সাজান গল্পমাত্র। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ'—ঋণ ক'রে খেতে হলেও খেয়ে যাও; পরিশোধের কথা চিন্তা কোরো না—উহা এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, আজ পর্যন্তও উহাকে 'লোকায়ত দর্শন' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় বুদ্ধদেব বেদান্তকে প্রকাশ ও সাধারণের মধ্যে উহার প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন (১৪)। (লণ্ডনে বক্তৃতা— ৮৯৬)।

[দেখা যায়] সেই সময়ে [বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রাক্কালে] দেশের আকাশ-বাতাস বাদ-বিতণ্ডায় ভরিয়া আছে। বিশ হাজার অন্ধ পুরোহিত দুই কোটি পরস্পর-বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপ শঙ্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচারকার্য অপেক্ষা জাতির পক্ষে বেশী প্রয়োজন আর কি থাকিতে পারে? (আমেরিকায় বক্তৃত —১৮৯৫)।

বৌদ্ধধর্মের অবদান

যজ্ঞাদিতে পশুবধ-নিবারণ, বংশগত-জাতিভেদ ও পুরোহিত-কুলের আধিপত্যলোপ, এবং চার্বাকের নাস্তিকমত ও জড়বাদের হাত

(১৩) বুদ্ধের আবিভাবপ্রসঙ্গে স্বামীজীর এই কথাগুলিকে ধর্মের গ্লানি ও উহার প্রতিকারকল্পে কোনোএকজন অবতারপুরুষের আবির্তাব-সম্বন্ধীয় গীতোক্ত বাণীরই একটি স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা অথবা ভাষ্য বলা চলে না কি? প্রসঙ্গক্রমে, পৃথিবীব্যাপী ধর্মকর্মের বর্তমান পরিস্থিতিতে ও উহার আশু প্রতিকারকল্পে একপ শক্তিশালী কোনো-একজন পুরুষের আবিভাবের কথাটাও চিন্তনীয় হইয়া পড়ে না কি?

(১৪) স্বামীজীর মতে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তেরই একটি শাখা মাত্র।

হইতে জনগণের রক্ষা প্রভৃতি ছাড়াও, বৌদ্ধধর্মের অবদান প্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলিতে শোনা যায়—ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে একেশ্বরবাদ প্রবল হইতে পারে নাই (১৫)। (লণ্ডনে বক্তৃতা—১৮৯৬)।

বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতরপ্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ-সৃষ্টিকারী আভিজাত্য-প্রথাকে ভাঙ্গিয়া দেয়। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৫)।

বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত যে-কয়েকটি অতিসুন্দর বিশেষণের কথা আমার মনে আছে, ঐগুলি হইতেছে—[হে তথাগত] তুমি বর্ণাশ্রম-খণ্ডনকারী, সর্বঅধিকার-বিধ্বংসী, সর্বপ্রাণীর প্রতি সমভাবের শিক্ষাদাতা! (Thoughts on Vedanta—লণ্ডনে বক্তৃতা)।

শাক্যমুনি স্বয়ং একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর মহানুভবতার কথায় বলিতে হয়—তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যসকলকে বাহির করিয়া আনিয়া সেগুলিকে তিনি সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের [অন্যকথায় প্রচারশীল ধর্মের] তিনিই ছিলেন প্রথম প্রবর্ত্তক; কেবল তাই নয়, ধর্মান্তরিতকরণের ভাবও তাঁরই মনে সর্বপ্রথম উদিত হইয়াছিল।.... বুদ্ধের কোন-কোন ব্রাহ্মণশিষ্য তাঁর উপদেশগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন—'আমি দরিদ্রের জন্য—জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিতে চাই।' বস্তুতঃ আজপর্যন্তও তাঁর অধিকাংশ উপদেশই সেই সময়কার চলিত

---

(১৫) সগুণ দণ্ডধারী-ঈশ্বরের ভাব বা কল্পনা। 'এই একেশ্বরবাদ একেবারে প্রথমদিকে ভারতে দেখা দিয়েছিল; দেখিতে পাই সংহিতার [বেদের স্তোত্রাংশে] সর্বত্রই—উহার প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে, এই একেশ্বরবাদের প্রভাব'– বাণী ও রচনা ৩/২০৮। প্রসঙ্গান্তরে মূর্তিপূজা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামীজীকে যেমন বলিতে শুনা যায় তাহাতে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতে একেশ্বর-বাদ প্রবল হইতে না পারিলেও, উহারই অন্যতম ফল বা প্রতিক্রিয়া-স্বরূপেই কিন্তু, তাঁহার মতে, পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মে প্রতিমাপূজার উদ্ভব হইয়াছিল।

ভাষাতেই লিখিত দেখা যায় (১৬)। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৩)।

বৌদ্ধধর্মের সেই সমাজসংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্বসাধারণের মধ্যে এক অদ্ভুত উন্মাদনার ভাব বহাইয়া দিয়াছিল; যাহার ফলে ভারতীয় সমাজ এতদূর উন্নত ও মহান হইয়া উঠিয়াছিল যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক [মেগাস্থিনিস] বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কোনো হিন্দু মিথ্যা বলে, বা কোনো হিন্দুনারী অসতী —একথা শোনা যায় না। (ঐ—ঐ)।

আমার বিশ্বাস, ভগবান বুদ্ধের পর হইতেই সারা ভারতবর্ষে এই সন্ন্যাসব্রত বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে, এবং ত্যাগ ও বিষয়ভোগ-বিতৃষ্ণাই ধর্মজীবনের চরমলক্ষ্য ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে। বৌদ্ধধর্মের এই ত্যাগ-বৈরাগ্যকেই হিন্দুধর্ম নিজের ভিতর absorb ক'রে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী-মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। [পূর্বেও] সন্ন্যাসাশ্রম ছিল বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে উহা জীবনের

---

(১৬) অনুরূপভাবেই, লোকহিতার্থে নিজ জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে স্বামীজীকেও মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় বলিতে শুনা যায়—'আমার ইচ্ছা, আধ্যাত্মিকতার যে-সকল মণিমুক্তা গ্রন্থে অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের আয়ত্তে সঞ্চিত—মঠ-মন্দির বা অরণ্যের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে, প্রথমেই উহাদিগকে—উহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বসকলকে তাহাদের গুপ্তস্থান—ততোধিক দুর্ভেদ্য সংস্কৃতশব্দের শতশত-বর্ষব্যাপী কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহির করিয়া আনি। এক কথায়, আমি চাই এসকলকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে।

এইভাবে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করার পূর্বক্ষণে স্বামীজীকে ঐ দিন বলিতে শুনা গিয়াছিল —'কেবলমাত্র এইসব ভাব প্রচারের জন্যই আমাকে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যেতে হয়েছিল। ধর্মমহাসভাই হোক, আর অন্য যা কিছুই হোক, সেদিকে আমার আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিলনা; সে-সকলকে কেবল একটা সুযোগ বলেই ধ'রে নিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে, এই সকল ভাবই আমাকে জগৎ-পরিক্রমা করিয়েছিল।' (Complete works: Part III).

চরমলক্ষ্য ব'লে গণ্য হ'ত না; বৈরাগ্যের এতটা দৃঢ়তা ছিলনা, বিবেকনিষ্ঠাও ছিল না।···ভারতবর্ষের এই যে এতসব সন্ন্যাসীর মঠ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, এসব একসময়ে বৌদ্ধধর্মের অধিকারে ছিল; হিন্দুরা এ-সকলকে এখন তাদের নিজেদের রঙে রঙিয়ে নিয়ে নিজস্ব ক'রে ব'সেছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান বুদ্ধের সময় থেকেই সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল; তিনিই উহার মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার ক'রেছিলেন। পুরাণসকলের অধিকাংশ, মন্বাদি সংহিতা এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান বুদ্ধ এসবের ঢের আগে।····History পড়ে দেখ্, দেখ্‌তে পাবি,—হিন্দুধর্ম বুদ্ধের সব ভাবগুলি হজম ক'রে নিয়েই এতবড় হ'য়েছে। (Conversations and Dialogues)—স্বামীশিষ্য-সংবাদ)। [উল্লেখ্য, পরবর্তী কালে স্বামীজী তাঁহার এইরূপ মতের আংশিক পরিবর্তন করিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দু পৌরাণিক মতেরই সমর্থক হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে গ্রন্থপরিশিষ্টে আলোচনাটি দ্রষ্টব্য]।

হিন্দুধর্ম ও সমাজে বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মকে যে-চোখে দেখা হইয়া থাকে

চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান্ গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদি ছিলেন, শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন। ইহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এমনকি ক্রুশবিদ্ধকরিয়া হত্যা করিয়াছিলেন! [অন্যপক্ষে] হিন্দুগণ শাক্যমুনিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহার পূজা করেন।........শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন [ধ্বংস করিতে নয়]—তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মেরই একটি পরিণত রূপ (fulfilment)—যুক্তিগত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৩)।

বুদ্ধদেব ভারতের দেবদেবী, (১৭) এমনকি জগদীশ্বরকে পর্যন্ত

(১৭) পুস্তকখানির পরিশিষ্টে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী বলিতে হয়—বুদ্ধের সম-সাময়িককাল পর্যন্ত ভারতে কোনরূপ দেবদেবীর মূর্তি গঠন বা উহাদের পূজা প্রচলিত হয় নাই।

অস্বীকার করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও, বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। [অর্থাৎ কোনো ধর্মান্ধগণের হাতে তাঁহাকে অকালে প্রাণ হারাইতে হয় নাই]। তিনি ৮০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন এবং অর্ধেক দেশকে তাঁহার ধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন। (লণ্ডনে বক্তৃতা—১৮৯৬)।

বৌদ্ধধর্ম সব সময়েই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত ছিল। কেবল কোনো এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব বিশেষ প্রবল হইয়াছিল এবং উহার ফলে সমস্ত জাতিতে সন্ন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। (ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থাবলী হইতে উক্তি-সঞ্চয়ন)।

আমাদের ধর্ম এরূপ একটি ধর্ম যাহার দৃষ্টিতে [নিজস্ব সকল বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও]—বৌদ্ধধর্ম উহার একটি বিদ্রোহী-সন্তানমাত্র।....বৌদ্ধধর্ম [প্রকৃতপক্ষে] বৈদিক পৌরহিত্যবৃত্তির বিরুদ্ধে নবগঠিত ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর বিদ্রোহ।....বৌদ্ধধর্ম হইতে উহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া, হিন্দুধর্ম উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সকল আচার্যগণেরই প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিলন ঘটানো। শঙ্করাচার্যের উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়। (মাদ্রাজে বক্তৃতা—১৮৯২-৯৩)।

একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সর্বত্রই দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্মের সারাংশ উপনিষদগুলি হইতেই গৃহীত। এমনকি, যে-নীতিতত্ত্বকে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ, অত্যাশ্চর্য অবদান বলিয়া বলা হইয়া থাকে, কোন-না-কোন উপনিষদে পূর্ব হইতেই অক্ষরে-অক্ষরে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (মাদ্রাজে বক্তৃতা-১৮৯৭)।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ

আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ঈশ্বরের [ব্রহ্মের] সহিতই ছিল ; এবং সেই শব্দই ঈশ্বর (ব্রহ্ম) (১৮)। হিন্দুরা এই শব্দকে মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব ব'লে ব'লে থাকেন, কারণ এটি ব্রহ্মেরই শক্তি। সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তার বিশ্বজগৎরূপে প্রতিফলিত রূপকেই আমরা প্রকৃতি ব'লে থাকি।

(১৮) Gospel according to st. John : New Testament.

শব্দের দুইটি প্রকাশ, একটি এই প্রকৃতির সাধারণরূপে, আর একটি—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারপুরুষগণের বিশেষ-রূপে। (Inspired Talks—আমেরিকা)।

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ একটি অবস্থাবিশেষের নাম, যা আমাদেরও লাভ করতে হবে। [এককালের] যীশু ও গৌতমনামধারী ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়াই [পরবর্তী কালে] এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। Mother (জগন্মাতা বা আদ্যাশক্তি) [কিংবা যাঁহাকে পরমাপ্রকৃতি বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে] ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তারপর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ।....সেই জগদম্বার এককণা—একবিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এককণা বুদ্ধ, আর এককণা খ্রীষ্ট (ঐ ঐ)।

মহাপুরুষেরা ধর্ম প্রচার ক'রে যান, কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারপুরুষেরা ধর্ম দিতে পারেন,—এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষে একটি কটাক্ষ বা একবারমাত্র স্পর্শই যথেষ্ট। (১৯) (ঐ-ঐ)।

জগতে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, চরিত্রহিসাবে তাঁহাদের

---

(১৯) প্রসঙ্গক্রমে ইদানীংকালে অপ্রচলিত বায়বীয়-সংহিতাদির শাম্ভবী-দীক্ষার কথাটাই আসিয়া পড়ে—'গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শেন সম্ভাষণাদপি'—শ্রীগুরুর দর্শন, স্পর্শন অথবা সম্ভাষণমাত্রই (জ্ঞানোদয় হয়)। আমাদের বেদোপনিষদেও এই জাতীয় কথা বা 'শ্রবণের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ফলে শ্রবণমাত্রই শ্রোতার মনে (কোনরূপ পৃথক চেষ্টা বিনাই) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্যনিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে বলিয়া বলা হইয়াছে। তবে এরূপ উচ্চাধিকার-সম্পন্ন বক্তা বা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এবং তীব্র বৈরাগ্য-বান শ্রোতা অথবা শিষ্য উভয়ই সর্বকালে, বিশেষতঃ একালে, নিতান্ত দুর্লভ বলিয়াই, পরবর্তিকালের অভিজ্ঞ আচার্যগণকে সাধকের পক্ষে, 'শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে'র মধ্যে এরূপ 'শ্রবণের' আশায় বসিয়া থাকা অপেক্ষা, শ্রুত বিষয়ে মনন ও নিদিধ্যাসনের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। স্বামীজীরও যে-উক্তিটি—'ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে' উহারও তাৎপর্য এইরূপই মনে হয়।

মধ্যে বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ, তারপর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণের যে শিক্ষা, জগতে উহাই সর্বোত্তম শিক্ষা। (ঐ-ঐ)।

[আত্মা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া] এই আত্মা জড়বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ সুপ্ত, (সাধারণ) মনুষ্যাদি প্রাণীগণের মধ্যে কতকাংশে জাগ্রত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, এবং শঙ্করের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ইহা জ্ঞানাতীত ভূমিতে (Super-conscious Stage-এ) উপনীত। এ অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে সত্য, কিন্তু উহা বাক্যমনের অতীত। (Conversations and Dialogues)—স্বামীশিষ্য সংবাদ)।

'অতিচেতন স্তরে (Super-Conscious Stage-এ) উপনীত হইলে, মানুষ মুক্তিলাভ করে—ঐশ্বরিক সত্ত্বা প্রাপ্ত হয়। তখন মৃত্যু অমৃতে, দুর্বলতা অনন্তগুণ সবলতায়, এবং কঠোর বন্ধনদশা মুক্তাবস্থায় পরিণত হয়। অতিচেতনার এই সীমাহীন মানসলোকই আমাদের গন্তব্যস্থল।' (Complete Works : **Part II**).

পৃথিবীর ইতিহাস, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষগণেরই জীবনের ইতিহাস। নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সবচেয়ে বেশী কল্যাণ ক'রে থাকেন। (লণ্ডনে বক্তৃতা—১৮৯৫)।

জগতের ইতিহাস পড়িয়া আপনারা কি জানিতে পারেন নাই —মহাপুরুষদের শক্তির উৎসটা কি? কোথায় উহা ছিল? বুদ্ধিতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি কখনও দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় কোন একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়শাস্ত্রের বিচার-বিতর্ক পদ্ধতি লইয়া কোন গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন? তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকতক কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়বান হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। হৃদয়ই জীবন, হৃদয়ই বল, হৃদয়ই তেজ। হৃদয়ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা করা যাক না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হইবে না। (ঐ—১৮৯৬)।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঠিক্-ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই।....যীশুর মতো তিনিও পূর্ণকরিতেই

আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয় (২০)। প্রভেদ এই যে, যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ অর্থাৎ ইহুদীরাই তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই, আর বুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের শিষ্যগণই তাঁর শিক্ষার মর্মগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ইহুদীরা যেমন (যীশুর মধ্যে) ওল্ড-টেস্টামেণ্টের পূর্ণ-পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পূর্ণ-পরিণতি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৩)। [বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহার কারণস্বরূপ এখানেও সেই অধিকারীভেদের কথাটাই আসিয়া পড়ে। দেখা যায়, 'স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা' প্রভৃতি যীশুখ্রীষ্টের যে-সকল উক্তি, তাঁহার প্রথম শিষ্যগণ সে-সকলের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনুরূপভাবেই, বহুবিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের যে-নীরবতা, উহাই যে শেষপর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অজ্ঞেয়বাদ বা নিরীশ্বরবাদের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এরূপ মনে করাটাও বোধহয় অযৌক্তিক নহে।]

আমার একটা বিশেষ ধারণা হ'ল, বুদ্ধই খ্রীষ্ট হ'য়েছিলেন। বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'পাঁচ-শ বছর পরে আবার আমি আস্‌ব' এবং পাঁচ-শ বছর পরে খ্রীষ্ট এসেছিলেন। এঁরা সমগ্র মানব-প্রকৃতির দুই আলোকস্তম্ভ। দুটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; এঁরা দুটি বিরাট শক্তি—দুটি প্রচণ্ড বিশাল ব্যক্তিত্ব, দুটি ঈশ্বর! জগৎটাকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর যেখানেই সামান্য জ্ঞান আছে, সেখানেই মানুষ বুদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টের নামে মাথানোয়ায়। তাঁদের মতো আর হওয়া খুবই কঠিন, তবে আশাকরি, আরও হবে।.... কয়েক হাজার বছরের মধ্যে যীশু ও বুদ্ধের মতো দু'জন মানুষ জন্মানো একটা বিরাট ব্যাপার। এমন দু'জন মানুষই কি যথেষ্ট নয়? খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন, * অন্যেরা হ'লেন ধর্মাচার্য। এই দু'জনের জীবন অনুশীলন কর এবং তাঁদের মধ্যে শক্তির বিকাশ লক্ষ্য কর—দেখ কী শান্ত, অপ্রতিরোধের জীবন—ঝুলিতে একটি কপর্দকও নেই, এমন দরিদ্র

---

(২০) যীশুর বাণী—I have come to fulfil and not to destroy.

ভিক্ষুকের মতো, সারাজীবন ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, ধর্মদ্রোহী ও নির্বোধ ব'লে কথিত—আর ভেবে দেখ, সমগ্র মানবজাতির উপর কী বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁরা মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। (স্বামীজীর নিজস্ব বিবিধ রচনা হইতে—বাণী ও রচনা : ১০ম খণ্ড)। [অর্থাৎ* 'মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি']। (বাণী ও রচনা ৪।৩২ পৃ:)।

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম

খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারত প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশগুলির উৎসমূলের সন্ধান করিলে দেখানো যাইতে পারে যে, উহা বুদ্ধের বাণীর ভিতরেই রহিয়াছে।....যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগান্তে নির্জনবাস, অন্তরঙ্গ-শিষ্যসংখ্যা, এবং নৈতিক শিক্ষাদান, তাঁর আবির্ভাবের বহুশতবৎসর-পূর্বেকার বুদ্ধজীবনের ঘটনারই অনুরূপ। ....খ্রীষ্টধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ভারত-সম্রাট অশোকের সম্প্রতি-আবিষ্কৃত শিলালিপিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক-সম্রাটগণের সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে-সকল অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করে, সম্রাট অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ সেই সকল স্থানেই একদা বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাবিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়,—খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ এবং ভারতীয় নীতিতত্ত্ব কি করিয়া প্রবিষ্ট হইল; এবং কেনই-বা আমাদের দেশের দেবমন্দিরের পূজার্চনার সাথে আপনাদের ক্যাথলিক গির্জার 'মাস' (২১) এবং 'আশীর্বাদ' প্রভৃতি ধর্মীয় আচার-আচরণের এতটা সাদৃশ্য দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্মের বহুপূর্বে বৌদ্ধধর্মে এই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৫)।

বৌদ্ধধর্মই খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)। খ্রীষ্টানদের ব্যাপ্টিজম্-

(২১) যীশুখ্রীষ্টের শেষনৈশভোজ-স্মরণে রুটি ও মদ্যের পূজোপহার-অনুষ্ঠান।

সংস্কার অন্তঃশুদ্ধির প্রতীকরূপে একটি বাহ্যশুদ্ধির ব্যাপার। বৌদ্ধধর্ম থেকেই এর উৎপত্তি। (Inspired Talks—আমেরিকা)। এই যে খ্রীষ্টনীতি (খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার)—এই যে ক্যাথলিক চার্চ, এ-সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কি ভাবে এটা [সম্ভব] হয়েছিল? একফোঁটাও রক্তপাত না করে! (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

উক্ত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের অন্য-একটি বক্তৃতায় আমেরিকান খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্যে স্বামীজীকে রহস্যচ্ছলে বলিতে শোনা যায়—বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পরে মানুষের নরকে শাস্তিভোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে খ্রীষ্টানদের মত হইতে উহার পার্থক্য দেখা যায়। খ্রীষ্টানেরা ইহলোকে মানুষকে পাঁচ-মিনিটের জন্য ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু পরলোকে তার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে থাকেন। বুদ্ধই প্রথম বিশ্বজনীন-ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেন। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি প্রধান নীতি। খ্রীষ্টানেরাও ইহা প্রচার করেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ অভ্যাস করেন না। [উদাহরণ-স্বরূপে স্বামীজীকে দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের সাথে ব্যবহারের উল্লেখ করিতে দেখা যায়]।

এই প্রসঙ্গে, ইহার মাত্র কয়েকদিন পূর্বেকার অন্য একটি আমেরিকান বক্তৃতার অংশবিশেষেরও এখানে উল্লেখ করা গেল—'ঈশ্বর নিয়ে জীবন-যাপন—তাঁর ভাব নিয়েই বিচরণ—এই এইখানে, এই শরীরেই! সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে, সমস্ত কুসংস্কার দূর করে দিতে হবে! ভারতে এখনও এ-রকমের মানুষ আছে। এ-দেশে সে-রকম মানুষ কই? আপনাদের প্রচারকেরা 'স্বপ্নবিলাসীদের' সমালোচনা ক'রে থাকেন; এখানে আরও কিছুসংখ্যক 'স্বপ্নবিলাসী' থাক্‌লে, এদেশের মানুষ সমৃদ্ধিশালী হ'তে পারত। এখানে কেউ যদি যীশুখৃষ্টের উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে [অন্যকথায় বল্‌তে হয়, করতে চেষ্টিত হয়] তাকে 'ধর্মোন্মত্ত' বলা হবে। 'স্বপ্নবিলাস' এবং উনবিংশ শতাব্দীর দাম্ভিকতা—এতদুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। গুণগ্রাহী মধু-মক্ষিকা ফুলেরই সন্ধান করে। হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত করুন। উপলব্ধি করুন—সমগ্র জগৎ ঈশ্বরভাবে-পূর্ণ, পাপ-পূর্ণ নয়! আমরা যেন পরস্পরকে

সাহায্য করি,—পরস্পরকে ভালবাসি। বৌদ্ধদের একটি অতি-সুন্দর প্রার্থনা—'সকল সাধু-সন্তকে প্রণাম, সকল মহাপুরুষগণকে প্রণাম, জগতের সকল পবিত্র-নরনারীকে প্রণাম।'

বৌদ্ধধর্মের প্রচার : সম্রাট অশোকের শিলালিপির নির্দেশ

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান-প্রচারশীল ধর্ম—বৌদ্ধধর্মে আমরা দেখিতে পাই, প্রথিতযশা সম্রাট অশোকের শিলালিপিসমূহ সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, অ্যান্টিওক, পারস্য চীন প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্যজগতের বহুদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিরূপে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে ঐ সকল শিলালিপিতে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাঁহারা যেন অপরধর্মের নিন্দা না করেন। বলা হইয়াছিল,—যেখানকারই হউক, সকল ধর্মের ভিত্তি এক। সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে, যতটা পার সকলকে শিক্ষা দিবে, কিন্তু কাহারও মনে আঘাত দিয়া নয়! (Thoughts on Vedanta—আমেরিকায় বক্তৃতা)।

সাকারোপাসনা। প্রতীকোপাসনা। গ্রন্থোপাসনা। প্রতিমা বা মূর্তি-উপাসনা। বুদ্ধ, কৃষ্ণ অথবা খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যগণের উপাসনা

আমাদের দেশে এমন সব সম্প্রদায় আছে যাহারা বিশ্বাস করে, ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং মানবরূপ পরিগ্রহ করেন। কিন্তু তাহাদের মতে মানবরূপে-অবতীর্ণ ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে। যদি তাঁহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা তাঁহাকে মানিবে না। হিন্দুগণ বুদ্ধকে পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা যখন বুদ্ধের উপাসনা কর, তখন তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলনা কেন? তাহারা বলিবে—'যেহেতু বৌদ্ধেরা বেদ অস্বীকার করিয়া থাকে'। গ্রন্থোপাসনার তাৎপর্য এইরূপই।...কোনো নূতন-কিছুই মানুষ লইতে চাহেনা, যদি কিনা উহা বেদ বা বাইবেলে না থাকে। এটি একটি স্নায়ুঘটিত ব্যাপার। নূতন কোন-কিছু শুনিলে

বা দেখিলেই মানুষ চমকিয়া ওঠে, —মানুষের শরীরের গঠনই এইরূপ। চিন্তাসম্বন্ধে তো একথা আরও বেশী করিয়া সত্য। আমাদের মন প্রচলিত-পথেই চলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; তার পক্ষে নূতন কোনো ভাবধারা গ্রহণ করা নিতান্তই কষ্টসাধ্য (২২)। কাজেই কোনো নূতন ভাবকে প্রচলিত চিন্তাধারার খুব কাছাকাছি রাখিলে, তবেই আমাদের মন উহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিয়া থাকে। কৌশল হিসাবে ইহা ভাল বটে, কিন্তু নীতি হিসাবে মন্দ। [মনে হয়, এখানে স্বামীজী সকল প্রকার ধর্মীয়-সংস্কারসম্বন্ধেই এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। কোনো জটিল তত্ত্বকথা বলিতে বা বুঝাইতে গিয়া, শ্রোতার বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য বক্তাকে অনেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকাদির উল্লেখ করিতে দেখা যায়। যাহাতে শ্রোতা তাহার পূর্ব-সংস্কারের সহিত মিলাইয়া লইয়া বক্তব্য-বিষয় নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারে, সেদিক দিয়া এটি একটি উত্তম কৌশল; কিন্তু ইহাদ্বারা শ্রোতার স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া নৈতিক দিক হইতে ইহাকে মন্দই বলিতে হয়। পরবর্তী কথাগুলিতে এইভাবই পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়]।

……ভয় হয়, আমাকে হয়তো-বা পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, গ্রন্থসকল ভাল অপেক্ষা মন্দই বেশী করিয়াছে (২৩)। এ ব্যাপারে আমরা নিজেরা কি বিশ্বাস করি, কতটা কি অনুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছি, সে-সম্বন্ধে চিন্তা করাটাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। ঈশা-মূশা-বুদ্ধ কি করিয়াছিলেন, তাহাতে

---

(২২) কেবল ধর্মকর্মবিষয়েই নহে, অন্যত্রও এরূপ দৃষ্টান্তের কোন অভাব নাই। যেমন, যাহারা কেবলমাত্র গল্প বা উপন্যাসাদিই লিখিতে বা পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া যান, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁহারা ক্রমে-ক্রমে গুরুতর কোনো বিষয়ে চিন্তা করিবার ইচ্ছা বা শক্তি হারাইয়া ফেলেন।

(২৩) গ্রন্থসম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে স্বামীজীকে এরূপও বলিতে শুনা যায়—'তবে উহার একটি বড় গুণও আছে।' উহা একটি শক্তির উৎস। যে-সকল সম্প্রদায়ের এক-একখানি গ্রন্থ আছে, সেগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে।'

আমাদের কোন কাজই হইবে না, যতদিন-না আমরা নিজেরাও সেগুলি কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছি। ....আমি স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস করি। আমার মতে, এইসব পবিত্র-স্বভাব আচার্যগণের প্রভাব হইতেও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করুন, কিন্তু ধর্মকে একটা স্বাধীন গবেষণার বিষয়-বস্তুরূপে গ্রহণ করুন। তাঁহারা যেভাবে জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন, আমাকেও ঠিক সেইভাবেই উহা লাভ করিতে হইবে। ....তাঁহাদের জ্ঞানালোক-লাভের দ্বারা কোনমতেই আমাদের পরিতৃপ্তি আসিবে না।....বাইবেল হইতে হইবে, অনুসরণমাত্র করিলে চলিবে না ...বাইবেলকে কেবল পথের আলোকরূপে—পথপ্রদর্শকস্তম্ভ বা নিদর্শন-স্বরূপে শ্রদ্ধা করিতে হইবে; ইহাই এর যাকিছু মূল্য! (২৪)। (Address on Bhakti-yoga—ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা)।

এরপর পূর্বকথার অনুসরণে স্বামীজীতে বলিতে শোনা যায়—গ্রন্থের মূল্য ঐ পর্যন্ত; কিন্তু প্রতিমা প্রভৃতির বিশেষ আবশ্যকতা আছে।.... দুই প্রকার মানুষের কোনরূপ মূর্তির প্রয়োজন হয় না; নরপশুর, যে ধর্মের কোনো ধারই ধারেনা; আর সিদ্ধপুরুষের, যিনি এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী আমাদের জন্য ভিতরে ও বাহিরে কোন-না-কোনরূপ আদর্শ বা মূর্তির প্রয়োজন রহিয়াছে (২৫)। কোনপ্রকার ব্যক্তিরূপের প্রতি আকৃষ্ট হইও না—একথা বলা খুব সহজ বটে, কিন্তু দেখা যায় যে একথা বলে, সে নিজেই ব্যক্তিভাবের উপর অতিমাত্রায় আসক্ত; বিশেষ-বিশেষ নরনারীর উপর তার তীব্র আসক্তি,—মরিয়া গেলেও তাঁদের প্রতি তার আসক্তি যায় না, মৃত্যুর পরেও সে তাদের অনুসরণ করিতে চায়!

---

(২৪) বাইবেলসম্বন্ধে এখানে যেরূপ বলা হইয়াছে, জগতের অন্যসকল প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থসম্বন্ধেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

(২৫) সাকারাবলম্বনেই যে নিরাকারে পৌঁছাইতে হয়, স্বামীজীর কথাগুলিতে এখানে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। তুলনীয় শাস্ত্রীয় বচন—'সাকারেন বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি'।

ইহাই [প্রকৃতপক্ষে] পুতুলপূজা।....কোনো একজন সাধারণ নর বা নারীর উপর আসক্ত হওয়া অপেক্ষা, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমূর্তির উপরে ব্যক্তিগতভাবে আসক্তি বা আকর্ষণ থাকাটা কি বেশী ভাল নয়? বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমা মানুষকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা (যাহাও প্রকৃতপক্ষে প্রতীকোপাসনা) মানুষকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু এরূপ উপাসনা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। তাহাকে এসব অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। ....যে-কোন বস্তুকে ঈশ্বরবোধে উপাসনা করা যাইতে পারে বটে, যদি কিনা মূর্তির কথা ভুলিয়া সেখানে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পারি। ঈশ্বরে কোনো প্রতীক বা মূর্তি আরোপ করা চলিতে পারে না, কিন্তু যে-কোন প্রতীক বা মূর্তিকে ঈশ্বরের দিব্যভাবে পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। [অর্থাৎ ঈশ্বরকে কোন-কিছুতেই সীমাবদ্ধ করা চলে না; কিন্তু সব-কিছুকেই ঈশ্বরের প্রতীক বা প্রকাশ বলিয়া মনে করা চলিতে পারে] (২৬)—স্মরণীয় : শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটি 'ঈশ্বরের ইতি করতে নেই।' (ঐ-ঐ)।

বুদ্ধকর্তৃক ক্রমাগত সগুণঈশ্বর-ভাবকে আক্রমণের ফলেই ভারতে [পরবর্তী কালে] প্রতিমাপূজার উদ্ভব হয়েছিল। বৈদিকযুগে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শনের বিধি ছিল বলেই, কোন একটি বিশেষ প্রতিমাতে ঈশ্বরপূজা অজ্ঞাতই ছিল [অর্থাৎ উহার কোনো প্রয়োজনবোধ ছিলনা]। কিন্তু বুদ্ধের বিরূপ প্রচারের ফলে 'জগৎস্রষ্টা ও বিশ্বপাতা' [সগুণ] ঈশ্বরকে হারিয়ে ফেলেই, ওর পরিবর্তে প্রতিমাগড়া সুরু হয়ে গেল। (২৭) এবং কালে-কালে বুদ্ধ ও খ্রীষ্টেরও প্রতিমূর্তি তৈরী হ'ল। কাঠ ও পাথর থেকে সুরু ক'রে, খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের মূর্তিপর্যন্ত সবই প্রতিমার অন্তর্গত। কিন্তু কোন-না-কোন মূর্তি বা প্রতিমা আমাদের চাই-ই চাই। (Inspired Talks—আমেরিকা)।

---

(২৬) কথাগুলি বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য ; অন্যথায়, নিষ্ঠার পরিবর্তে গোঁড়ামীর সৃষ্টি হওয়ায় সাধনপথে অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

নির্গুণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যায় না; সুতরাং আমাদের পক্ষে আমাদেরমতো-প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশ-বিশেষকেই উপাসনা করতে হবে। যীশু আমাদের মতোই প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তিনিই পরে খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই আমাদের পক্ষেও এরূপ হওয়া সম্ভবপর এবং হতেও হবে। (ঐ-ঐ)

কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা (ঐ-ঐ)।

এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত-মানুষই সেই পরমপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব, যিনি নিজেই কারণ ও কার্য—অব্যক্ত ও ব্যক্ত-স্বরূপ। এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, কেন মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই এটি-ওটির পূজার্চনা করিয়া থাকে এবং কেনই-বা পূর্ণতা-প্রাপ্ত-নরগণ সকল দেশের মানুষের কাছেই ঈশ্বররূপে স্বতঃস্ফূর্ত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইহার বিরুদ্ধে আপনারা যাহা খুশি বলিতে পারেন, কিন্তু মানুষ কখনই এরূপ ব্যক্তিগণকে পূজা না করিয়া থাকিতে প্যারে না। এইজন্যই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের ন্যায় জীবন্ত আদর্শসকল লোক-সমাজে পূজিত হইয়া থাকেন।....আপনি বা আমি ঈশ্বরসম্বন্ধে যে-সকল ধারণা করিয়া উঠিতে পারি, ইহারা তাহাঅপেক্ষা অনেক—অনেকগুণে বড় (আমেরিকায় বক্তৃতা— ১৮৯৬)।

জগতের শ্রেষ্ঠ-মানবগণ : 'বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণের' সহিত তুলনা

জগতের শ্রেষ্ঠ-মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানেনা, তাঁহাদের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত 'বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ' দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি মাত্র। এইরূপ শত-শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নীরবে জীবনযাপন করিয়া, নীরবেই চলিয়া যান। সময়ে তাঁহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মহামানবে ব্যক্তভাব ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হন। শ্রেষ্ঠ-মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য কোনরূপ নাম-যশের প্রত্যাশা করেন না। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব বিতরণ করিয়াই চলিয়া যান;

(২৭) এ বিষয়ে পাদটীকা (১৭) ও গ্রন্থপরিশিষ্টে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নিজেদের জন্য কিছুই দাবী করেন না ; নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমতও স্থাপন করিয়া যান না। ঐরূপ কিছু করিতে তাঁহাদের সমগ্র-সত্তাই সঙ্কুচিত হয়। তাঁহারা শুদ্ধসাত্ত্বিকভাবের লোক, কোনরূপ হৈ-চৈ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয় ; তাঁহারা প্রেমে একেবারে গলিয়া যান (২৮)। আমি এইরূপ একজন যোগী দেখিয়াছি। তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁর মন থেকে ব্যক্তিগত আমিত্বের বোধ এমন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে যে, একথা অনায়াসেই বলা চলে—সেখানে মনুষ্যভাব একেবারেই নাই, তৎপরিবর্তে রহিয়াছে সারাটি হৃদয় জুড়িয়া সর্বব্যাপী দিব্য-ঈশ্বরানুভূতি (২৯)।

শ্রেষ্ঠ-পুরুষগণ সত্য ও মহান্ ভাবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন ; পরে বুদ্ধ ও খ্রীষ্টগণ আসিয়া সেই সকল ভাব এখানে-ওখানে প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যান। গৌতমবুদ্ধের জীবনে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁর পূর্বে যে-চব্বিশজন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহারা অপরিচিত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ তাঁহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরেই নিজ ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ-পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত : কিন্তু তাহারাই ঠিক্-ঠিক্ জানেন চিন্তার শক্তি কতদূর ! তাঁহারা নিশ্চিত জানেন, যদি তাঁহারা কোনো গুহায় দ্বারবন্ধ করিয়া পাঁচটিমাত্র সৎচিন্তা করিয়াও দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া জীবিত থাকিবে। উহারা সত্য-সত্যই পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করিয়া এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, যাহারা জীবনে ঐগুলিকে কার্যে পরিণত

---

(২৮) স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটি—'পাকাসোনায় খাদ না দিলে গড়ন হয়না'—অর্থাৎ সামান্য পরিমাণেও রজোগুণের মিশ্রণ না থাকিলে কোনরূপ কর্মশীলতা থাকিতে পারেনা। এবিষয়ে স্বামীজীর পরবর্তী কথাগুলিও দ্রষ্টব্য।

(২৯) এখানে গাজীপুরের পওহারী বাবার কথাই বলা হইয়াছে।

করিবে (৩০)। পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক-ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে উদ্যমশীল হইয়া কোনরূপ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া, এমনকি এ-জগতের তথাকথিত জনকল্যাণমূলক প্রচার বা কাজকর্মে লিপ্ত হওয়াও কোনক্রমেই আর সম্ভবপর হয় না। কর্মীরা যতই ভাল হউন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবে কিছু-একটু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কম করিতে পারি। কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা অভিসন্ধি ও আসক্তিদ্বারাই পরিচালিত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেরা কর্ম করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মনে কোনরূপ আসক্তির লেশমাত্রও থাকেন না। যাঁহারা আত্মসমাহিত, আত্মরতি, আত্মার সহিত নিত্যযুক্ত [কেবল] তাঁহাদের পক্ষেই কোনো কর্মের প্রয়োজন নাই (৩১)। অন্যকে কর্ম করিতেই হইবে। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৩)।

কেন আমরা পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইব? মত ও পথ-নির্বিশেষে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিই শ্রদ্ধা-নিবেদন

মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, হিন্দুদের মধ্যে তো শত-শত। যতদিন পর্যন্ত মানুষের চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সম্প্রদায়ও থাকিবে।...পার্থক্যই জীবনের চিহ্ন এবং পার্থক্য থাকিবেই। আমি প্রার্থনা করি, সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে যত মানুষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি

---

(৩০) প্রকৃত নিষ্কামভাব বলিতে যে কী বুঝায় এবং উহার প্রভাব যে কত অমোঘ ও সুদূরপ্রসারী স্বামীজীর কথাগুলিতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পূর্বে ও পরে যাহা বলা হইয়াছে, উহা হইতে স্বামীজী ও তাঁহার নিজের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোনো কোনো ভবিষ্যৎবাণীর কিছুটা তাৎপর্যও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

(৩১) যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবাঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।—গীতা ৩/১৭।

হোক্, যাহাতে ধর্মবিষয়ে প্রত্যেকেই তার নিজের পথে—নিজের ব্যক্তিগত মতে চলিবার সুযোগ পায়।....চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকিবেই ; কারণ পার্থক্যই চিন্তার প্রথম লক্ষণ। আমি যদি একজন চিন্তাশীল লোক হই, তাহা হইলে আমার পক্ষে বিভিন্নভাবে-ভাবিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেই বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া উচিৎ।.... আমরা সকলে সত্যকেই দেখিতেছি ; এই-সমস্ত অবস্থার মধ্যদিয়া উহার যতটুকুমাত্র দর্শন পাওয়া সম্ভবপর, ততটুকুই পাইতেছি—উহাকে আমাদের আপন আপন হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত ক'রিয়া লইতেছি—নিজ-নিজ বুদ্ধিদ্বারা বুঝিতেছি, এবং নিজ-নিজ মনদ্বারা ধারণা করিতেছি। আমরা সত্যের শুধুমাত্র সেইটুকুই জানিতে পারি, যেটুকুর সহিত আমাদের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে বা যতটুকু পর্যন্ত আমাদের গ্রহণের ক্ষমতা আছে। এই হেতুই মানুষে-মানুষে প্রভেদ ঘটে ; এমনকি সময়-সময় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও, আমরা সকলেই সেই এক মহান্ সর্বজনীন সত্যের দ্বারাই বিধৃত হইয়া রহিয়াছি।....কাজেই, গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিৎ—বর্জন নয় (৩২)। কেবল পরমত-সহিষ্ণুতা নয়,—কারণ তথাকথিত পরমত-সহিষ্ণুতা বলিতে অনেক সময়ে ঈশ্বরনিন্দাই বুঝায় (৩৩) ; কাজেই উহাতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী ;

---

(৩২) এখানে স্বামীজীর কথাগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অন্ধগণের হাতী দেখা, কিংবা বহুরূপীর গল্পটিরই একটি ইতিবাচক ব্যাখ্যা বলিতে পারা যায় না কি? কেহই সম্পূর্ণরূপে দেখিতে না পারিয়া থাকিলেও, যে যতটুকু বা যেমন দেখিয়াছে, সেই একই হাতীটিকে বা বহুরূপীকেই দেখিয়াছে।

(৩৩) কথাগুলির তাৎপর্য হিসাবে মনে হয়, সৃষ্টপদার্থের নিন্দার ফলে সৃষ্টিকর্তাকেই নিন্দা করা হয়। সকল ধর্মমত ও পথই যদি ঈশ্বরেচ্ছায়ই সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, তবে উহাদের কোনো একটির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি কিংবা শ্রদ্ধার পরিবর্তে, কেবলমাত্র সহিষ্ণু বা সহনশীল মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার অর্থ—ঈশ্বরের কার্যে দোষদর্শন—প্রকারান্তরে ঈশ্বরনিন্দাই!

আমি কেন 'পরমত-সহিষ্ণু' হইতে যাইব ? পরমত-সহিষ্ণুতার অর্থ তো এই যে—আমি মনে করি আপনি অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে কোনমতে বাঁচিয়া থাকিতে দিতেছি।....অতীতে যত ধর্মমত ছিল, আমি সে-সবগুলিকেই সত্য বলিয়া মানি, এবং ঐ সকল ধর্মের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায় যেভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাদের প্রত্যেকের সাথেই ঠিক সেইভাবেই তাঁহার আরাধনা করি। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টানদের গির্জায় গিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধ ও তাঁর অনুশাসন-বিধির শরণ লইব। আমি অরণ্যে গমন করিব এবং প্রত্যেকের হৃদয়-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে-সচেষ্ট হিন্দুযোগীর সহিত একত্রে ধ্যাননিরত হইব !

অতীতের সকল ধর্মপ্রবর্ত্তকগণকে প্রণাম। বর্তমানের মহাপুরুষ-গণকে প্রণাম। যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন, এমন সকলকেও প্রণাম। (Universal-Religion-It's Realisation) আমেরিকায় বক্তৃতা—১৯০০)।

এইজন্যই, 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋগ্‌বেদের) এই মহা-বাণী আজও আমাদের নিকট অত্যন্ত সজীব, আরও বেশী মহান শক্তি ও জীবনপ্রদ হইয়া রহিয়াছে এবং যে-কালে এগুলি লিখিত হইয়াছিল, সে-সময়ের অপেক্ষাও এখন নবীনতররূপে প্রতিভাত হইতেছে (৩৪)। আমাদের এখনও শিখিতে হইবে যে,—সকল প্রকার ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান বা খ্রীষ্টান যে-নামেই অভিহিত হোক্ না কেন) সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে, এবং এগুলির

(৩৪) দেখা যায়, বেদের এই মন্ত্রটিতে এককালে কেবলমাত্র যম, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি বা প্রকাশ সমূহের মধ্যেই একত্বের কথা বলা হইয়াছিল অন্যপক্ষে। এখন একত্বের এই ধারণা কী জড়, কী চিৎ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সম্প্রসারিত। উল্লেখ্য, স্বামীজীর পরবর্তিকালে অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত আইনস্টাইনের আলোক-বৈদ্যুতিক তত্ত্বের আলোকের গতিবেগে চালিত কোনো একটি জড় বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া পড়িবার কথাটি।

একটিকেও যে ঘৃণা করে, সে [বস্তুতঃ] তার নিজের ভগবানকেই ঘৃণা করে। (Study of Religion : 'বৈদিক ধর্মাদর্শ' গ্রন্থের অনুবাদ অবলম্বনে)।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম—বৌদ্ধধর্মেও এইরূপ

যদি তুমি খ্রীষ্টধর্মের উৎসমূলে গমন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহা প্রত্যক্ষ-অনুভূতির উপর স্থাপিত। ····বৌদ্ধধর্মও ঠিক সেইভাবেই বুদ্ধের প্রত্যক্ষানুভূতি-প্রসূত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইগুলির দর্শন করিয়াছিলেন; সে-সকলের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং উহাদিগকে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋষিনামধেয় গ্রন্থকর্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন—'আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি'। তাঁহারা সেইগুলি জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, জগতের সকল ধর্মই আমাদের জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন—আত্মদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের নিকটেই নিজ-নিজ ভবিষ্যৎ ও অনন্ত-স্বরূপত্ব সুপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।····ইদানীং অনেক ধর্মেই এইরূপ একটি অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে,—'বর্তমানে এই সকল অনুভূতি একেবারেই অসম্ভব। যাঁহারা কোন-না-কোন ধর্মমতের প্রথম-প্রবর্তক বলিয়া পরবর্তীকাল হইতে ঐ সকল ধর্মমতের সহিত তাঁহাদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে কেবল এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষেই প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভবপর ছিল। আজকাল আর এরূপ অনুভূতি কাহারও হয়না; কাজেই ধর্মকে এখন একটি 'বিশ্বাসের বস্তু' বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।' এরূপ কথা আমি সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করি।··· যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ-বিষয়ে কেহ কখনও একটু-কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই নিশ্চিত-সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে

পারি যে, পূর্বেও কোটি-কোটিবার এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ ছিল, এবং পরেও অনন্তকাল ধরিয়া বারবার এরূপ সুযোগ আসিতে থাকিবে। একরূপতাই [Uniformity] প্রকৃতির কঠোর নিয়ম। একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় যে-কোন সময়েই তাহা আবারও ঘটিতে পারে (৩৫)। যোগবিদ্যার আচার্যগণ সেইহেতু বলিয়া থাকেন—'ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপরই স্থাপিত নয় : পরন্তু স্বয়ং এই সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, কেহই প্রকৃত ধার্মিক হইতে পারেনা'।....ধর্ম যতদিন-না অনুভূত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথা বলা বৃথা।....আত্মার অনুভূতি লাভ না করিয়া, 'আমার আত্মা আছে' অথবা ঈশ্বরদর্শন না করিয়া 'ঈশ্বর আছেন' এরূপ বলিবার কী অধিকার আছে মানুষের ? যদি [সত্যসত্যই] ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে ; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা না হইলে, বিশ্বাস না করাই ভাল। (৩৬) ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক অনেক ভাল।....মানুষ সত্য চায়—নিজে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়। যখন সে সত্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে—অন্তরের-অন্তরে উহাকে অনুভব করিতে পারে, কেবল তখনই (বেদ বলেন), তাঁর সকল সন্দেহ অপনীত হয়, সকল তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, এবং সকল বক্রতা সরলতা প্রাপ্ত হয় (৩৭)। (Six Lessons on Raja-yoga in America)।

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্য যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি ? না, তুমি-

---

(৩৫) বস্তুতঃ ব্যাপারটি এরূপ না হইলে, ধর্মকে কখনও 'সত্য' অথবা 'বিজ্ঞান' আখ্যা দেওয়া চলিতে পারিতনা। স্মরণীয় :—শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটি—'চাঁদামামা সকলেরই মামা' কিংবা যীশুখ্রীষ্টের বাণী—'He who asketh must receiveth'.

(৩৬) We must see religion, feel it, realise it in a thousand times more intense a sense than that in which we see the wall—(Lectures & Discourses—C/w : Part V).

(৩৭) 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' ইত্যাদি—মুণ্ডক উপঃ।

আমিও যে তাঁহাদের ন্যায় একরূপই অনুভব করিয়া থাকি, তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্মাই তাঁহাদের দিব্য-আত্মার প্রমাণ। [এমনকি] তোমার দেবত্বই স্বয়ং ঈশ্বরেরও প্রমাণ। (লণ্ডনে বক্তৃতা—১৮৯৬)।

ধর্ম বিষয়ে আধুনিক সমালোচনার উত্তর

একদিকে যেমন সকল-ধর্মের লোকদের উদ্দেশ্যেই বলিতে গিয়া স্বামীজীকে উপর্যুক্তভাবে প্রত্যক্ষানুভূতির উপরেই জোর দিতে দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি আবার অন্য একটি বক্তৃতায় ধর্মকর্মবিষয়ে ইদানীংকালের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অথবা সমালোচনার উত্তরেও তিনি বলিতে বাদ রাখেন নাই—'অমুক ঋষি বা মহাপুরুষ বলিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রসকলে বিশ্বাস কর—এরূপ বলাতে যদি ধর্মগুলি উপহাস্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিকতর উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ অথবা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয়; কিন্তু হাক্সলি, টিণ্ডাল বা ডারুইনের নাম করিলেই লোকে সে-কথা নির্বিচারে গলাধঃকরণ করে। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন'—অনেকের পক্ষে ইহা বলিলেই যথেষ্ট। আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে! তফাতের মধ্যে—আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, আর এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার। আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিত জীবনপ্রদ অধ্যাত্মিক ভাব, আর এখনকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিতেছে কেবল কাম ও লোভ। পূর্বের কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতিঘৃণিত ধন, মান ও ক্ষমতার উপাসনা,—ইহাই প্রভেদ! (ঐ-ঐ)।

শূন্যবাদ বনাম অদ্বৈতবাদ

[অন্যসকলের তুলনায়] বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদ—এদুয়ের মাঝখানে কোথায়ও থামতে পারা যায়না। বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়ে, তাদের মত যুক্তিদ্বারা যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা

নিয়ে গিয়েছিল। অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়ে সেই এক অদ্বয়-ব্রহ্মসত্তায় পৌঁছেছিল—যাথেকেই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও পৃথকত্ব বা বহুত্ববোধ আছে—যেদুটি অনুভূতির মধ্যে একটি মিথ্যা ও অপরটি সত্য হবেই। শূন্যবাদী পৃথকত্ব বা বহুত্ব-বোধকেই সত্য বলিতে চান; অন্যপক্ষে অস্তিত্ববাদী একত্ববোধকেই সত্য বলিয়া বলেন। সমগ্র জগৎ জুড়িয়া এই বিবাদই চ'লেছে।.... অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসা করেন—শূন্যবাদী একত্বের কোনো ভাব পান কি ক'রে? ঘূর্ণমান আলোটা (অলাতচক্র) বৃত্তাকার মনে হয় কি ক'রে? একটা স্থিতি স্বীকার করলে, তবেই তো গতির ব্যাখ্যা হ'তে পারে। দেখা যায়, সকল কিছুর পশ্চাতে একটা অখণ্ডসত্তার প্রতীয়মানতাকে শূন্যবাদী ভ্রান্তিমাত্র ব'লে মনে করেন বটে, কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তি যে কি ক'রে আদৌ সম্ভব, তা তিনি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। অপরপক্ষে অদ্বৈতভাববাদীও বোঝাতে পারেন না—এক বহু হ'ল কি ক'রে। এসবের একমাত্র ব্যাখ্যা কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থা থেকেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের সেই তুরীয় ভূমিতে—একেবারে সেই অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিতে হবে।...এইরূপে বোঝা যাচ্ছে—যেখানে দর্শনের শেষ, সেখান থেকেই ধর্মের আরম্ভ। (Inspired Talks—আমেরিকা)।

এরপর পরের বৎসর লণ্ডনের একটি বক্তৃতায় আপনা হইতেই প্রশ্ন তুলিয়া স্বামীজীকে বলিতে শোনা যায়—'কথা উঠিতে পারে, বৌদ্ধেরা যখন ঈশ্বর অথবা আত্মায় বিশ্বাস করে না [অন্য কথায় কোনরূপ অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসবান নয়], তখন তাহাদের ধর্ম কিরূপে অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, বৌদ্ধেরাও এক শাশ্বত নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী এবং সেই নৈতিক বিধান, 'যুক্তি' বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহা হইতে উত্থিত হয় নাই। অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পৌঁছিয়া বুদ্ধদেব উহা প্রত্যক্ষোপলব্ধি ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।....বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায়

পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহ এই অবস্থা হইতেই উদ্ভূত, বুদ্ধির গবেষণা হইতে নহে' (৩৮)।

অলৌকিক-ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা

আমি অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্যলাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্ন বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তাঁহাকে তথাকথিত অলৌকিক-ক্রিয়াকারী এক ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়া খুব উচ্চস্থান হইতে একটি পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। বুদ্ধদেবকে পাত্রটি দেখাইবামাত্র তিনি উহা পা দিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে কোনরূপ অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—সনাতন তত্ত্বসমূহের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করিতে হইবে। তিনি তাঁর শিষ্যদিগকে যথার্থ অভ্যন্তরীণ জ্ঞানালোকের বিষয়ে—আত্মতত্ত্ব—আত্মজ্যোতির বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন; আর ঐ আত্মজ্যোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ পন্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের প্রতিবন্ধক মাত্র। সেগুলিকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে (৩৯)।
(প্রশ্নোত্তর—আমেরিকা-১৮৯৯)।

এইরূপ কার্যের জন্য বুদ্ধ একটি ভিক্ষুর আলখেল্লা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা)।

বৌদ্ধধর্মে শূন্যবাদের উৎপত্তি ও প্রভাব

তিনি (বুদ্ধ) সকলকে শুনাইলেন—'কলহ বন্ধ কর, পুঁথিপত্র

(৩৮) এক কথায় বলিতে গেলে, এখানে বৌদ্ধদর্শনের মূলসূত্র 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' অর্থাৎ Law or theory of Discontinuous Continuity-র কথাটাই বলিতে হয়, যাহা বুঝিলে বৌদ্ধদর্শনের অনেক কথাই সহজবোধ্য হয়।

(৩৯) তুলনীয়: শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—'যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই [অলৌকিক যোগবিভূতি] চায়।...সিদ্ধাই থাক্‌লে মায়া যায় না,—মায়া থেকে আবার অজ্ঞান'।

তুলিয়া রাখো, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ করিয়া তোলো'।....ব্রাহ্মণগণকে তিনি বলিলেন—'প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা লোভ, ক্রোধ, এবং পাপকে জয় করিয়া থাকেন। তোমরা কি ঐরূপ করিতে পারিয়াছ? যদি না পারিয়া থাকো, তাহা হইলে আর ভণ্ডামি করিও না। জাতি হইল চরিত্রেরই একটি অবস্থা, উহা কোন কঠোরগণ্ডীবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে-কেহ ভগবানকে (৪০) জানে ও ভালবাসে সে-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ' (৪১)। যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিতেন—'যাগযজ্ঞ আমাদিগকে পবিত্র করে, এমন কথা বেদে কোথায় আছে? উহা হয়তো দেবতাদের সুখী করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কোন উন্নতি [পারমার্থিক উন্নতি] সাধন করে না।' পরবর্তী কালে বুদ্ধের এই সকল শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতের বাহিরেও যে-সকল দেশে উহা প্রচারিত হয়, সেখানকার অধিবাসীদেরও ঐ মহান সত্যসকল গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না। ঐ সকল জাতির বহু-বহু কুসংস্কার ও কদাচারের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরিয়া আসে ও কিম্ভূত-কিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে। এইভাবেই উৎপত্তি হয় শূন্যবাদী সম্প্রদায়ের, যাহাদের মতে বিশ্বসংসার, ভগবান, বা আত্মার কোন মূলভিত্তি নাই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সম্ভোগব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত না। ইহার ফলে, এই মত পরে অতি-জঘন্য কদাচারসমূহের সৃষ্টি করে। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৫)।

---

(৪০) কথাটিদ্বারা বুঝিতে হইবেনা যে, কথাপ্রসঙ্গে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন। 'বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও প্রচার করেন নাই, আবার ঈশ্বর যে নাই, তাহাও বলেন নাই' (স্বামীজীর আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

(৪১) 'ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো, যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।'—জটা, গোত্র, বা জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয়না। যাঁহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান, তিনিই পবিত্র—তিনিই ব্রাহ্মণ।—(ধম্মপদ ব্রাহ্মণ বগ্‌গো)।

নির্বাণ ও মুক্তি

তখনই তোমার নির্বাণপ্রাপ্তি হবে যখন তোমার 'তুমিত্ব' থাকবে না। বুদ্ধ বলতেন,—যখন 'তুমি' থাকবে না তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা—যথার্থ অবস্থা। (Inspired Talks—আমেরিকা)।

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুই নির্বাণ—এটি হচ্ছে নির্বাণতত্ত্বের 'না' এর দিক, যাতে বলা হয়—আমি এটা নই—ওটা নই। বেদান্ত আর এক ধাপ অগ্রসর হ'য়ে 'হাঁ' অর্থাৎ মুক্তির দিকটার কথা বলেন। 'আমি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ—আমিই সেই 'তিনি'—এই-ই হ'ল বেদান্ত—নিখুঁত খিলানটির শীর্ষপ্রস্তরখানি। উত্তরাঞ্চলীয় বৌদ্ধধর্মের বেশীরভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী, তারা প্রকৃতপক্ষে বৈদান্তিকই। কেবলমাত্র সিংহলবাসীরাই নির্বাণকে বিনাশ অর্থে গ্রহণ ক'রে থাকে। (ঐ—ঐ)। [এ বিষয়ে গ্রন্থপরিশিষ্টে আলোচনাটিও দ্রষ্টব্য]।

বৌদ্ধধর্ম কি 'দুঃখবাদ' ?

তিনি [বুদ্ধ] কোন নূতনধর্ম প্রচলিত করেন নাই, তাঁর আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। সকলের হিতকামনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর উপদিষ্ট ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। প্রথম—অশুভ আছে ; দ্বিতীয়—এই অশুভের কারণ যে কি—সে-সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিতেন, অশুভের কারণ, মানুষের অপরের উপর প্রাধান্যলাভের কামনা ; [এরপর তৃতীয়টি অর্থাৎ প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বলিতে শোনা যায়] নিঃস্বার্থপরতাদ্বারা এই দোষ দূর করা যাইতে পারে। বলপ্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিরোধ সম্ভবপর নয়। ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না ; ঘৃণাদ্বারা ঘৃণা নিবারিত হয়না।....এই মুখ্য সত্যটির উপরই তিনি সর্বদা জোর দিতেন : আমাদিগকে সৎ এবং পবিত্র হইতে হইবে এবং অপরকে পবিত্র হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে।....অপরের কল্যাণ-সাধনের দ্বারাই আমরা নিজেদের মঙ্গলবিধান করি। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

[এইভাবে, দুঃখ আছে, উহার কারণ আছে, এবং দুঃখনিবৃত্তির

উপায়ও আছে, দেখান হইয়াছে বলিয়া, বৌদ্ধধর্মকে প্রকৃতপক্ষে 'দুঃখবাদ' বলিয়া বলা চলিতে পারে না]।

বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক-দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায় ?

বৌদ্ধগণ বলেন, পরিদৃশ্যমান ঘটনা-বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপনকারী কোন কিছুর সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই ; এই জগৎপ্রপঞ্চ লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যতই বেদনাদায়ক ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে হউক না কেন, এই বৈচিত্রই জীবনের মূলবস্তু। ইহার অধিক কিছু আর আমরা পাইতে পারিনা। [অন্যপক্ষে] বৈদান্তিকের বক্তব্য, —একমাত্র একত্বই বর্তমান রহিয়াছে। বৈচিত্র শুধু বহির্বিষয়ক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপাতপ্রতীয়মান। বৈদান্তিক বলেন,—বৈচিত্রের দিকে তাকাইও না, একত্বে ফিরিয়া যাও। বৌদ্ধ বলেন, ঐক্য পরিহার কর, ইহা একটি ভ্রমমাত্র। বৈচিত্রকে স্বীকার করিয়া লও। একপক্ষ চান,—আমরা এই জগৎপ্রপঞ্চ ও উহার এইসব বৈচিত্রকে লইয়াই থাকি। প্রভূত যুক্তিদ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে, বৈচিত্র থাকিবেই থাকিবে ; উহা বন্ধ হইয়া গেলে, সব কিছুই লুপ্ত হইয়া যাইবে। জীবন বলিতে আমরা যাহাকিছু বুঝি, উহা এই বৈচিত্রেরই ক্রিয়া। অপরপক্ষ আবার নিঃসঙ্কোচে একত্বের দিকেই আমাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন। ভারতীয় মন (বৈদান্তিক মনকেই আমি এখানে ভারতীয় মন বলিয়া বলিতেছি) অধিকতর বিশ্লেষণ-প্রবণ বলিয়া, ইহার সকল বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ এই ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে ; এবং সবকিছুকেই একমাত্র এই ঐক্যের ধারণার উপরেই স্থাপন করিতে চাহিয়াছে, যদিও (যেমন আমরা দেখিয়াছি) এই একই দেশে অন্যমতবাদীরা (যথা বৌদ্ধগণ) কোথায়ও ঐ ঐক্য দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের নিকট সত্য অর্থে কতকগুলি বৈচিত্রের-সমষ্টিমাত্র বোঝায় :—একটি বস্তুর সহিত অন্য একটি বস্তুর কোনই সম্পর্ক নাই। (Thoughts on Vedanta—লণ্ডনে বক্তৃতা।

বৌদ্ধমত বনাম বিজ্ঞানবাদ (Idealism)

আধুনিক বৌদ্ধেরা শিক্ষা দেন যে, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়

এমন কোনো কিছুর অস্তিত্বই নাই এবং মানবাত্মার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এরূপ মনেকরাটা ভ্রমমাত্র; অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদীরা (Idealists) দাবি করেন যে, প্রত্যেক্ষ ব্যক্তিরই একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তাহার মানসিক ধারণার বাহিরে বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নাই। এই সমস্যার নিশ্চিত সমাধান এই যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্রতার—বস্তু ও ধারণার সংমিশ্রণ। আমাদের দেহমন বহির্জগতের উপর নির্ভরশীল এবং বহির্জগতের সহিত উহাদের সম্বন্ধের প্রকৃতি অনুযায়ী এই নির্ভরশীলতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর যেমন স্বাধীন, প্রত্যগাত্মাও [জীবাত্মা] তেমনি স্বতন্ত্র, এবং শরীর ও মনের বিকাশানুযায়ী তাহাদের গতিকে অল্পাধিক নিয়ন্ত্রণে সমর্থ। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

বেদান্তদর্শনের বৈশিষ্ট্য—বৌদ্ধাদি ধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধ

বেদান্তদর্শনের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক,—ইহার উদ্ভবের জন্য ইহা কোনো ব্যক্তি বা ধর্মগুরুর নিকট ঋণী নয়, ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই। অথচ যে-সব ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার কোন বিদ্বেষ নাই। পরবর্তিকালে ভারতবর্ষে বহু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মমত ও ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা বৌদ্ধধর্ম কিংবা আধুনিককালের কয়েকটি ধর্মমত (৪২)। ....কিন্তু বেদান্ত-

(৪২) বৈদান্তিক ধর্ম বা দর্শনের সহিত তুলনায় এই জাতীয় ধর্মমত-সকলের সম্বন্ধে স্বামীজীকে অন্যত্র একস্থানে বলিতে শোনা যায়—খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের, মুসলমানধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, এবং জৈনধর্ম জিনগণের জীবন-ভিত্তিক; অন্য অনেক ক্ষেত্রেও এইরূপই। যদি ভবিষ্যতে কখনও অতীতের এই সকল ধর্মগুরুগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ ক্ষীণবল হ'য়ে পড়ে, তবে ঐ সকল ধর্মের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যেতে পারে। আমরা কিন্তু এরূপ কোনো দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেয়েছি। কারণ, আমাদের ধর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল নয়। ইহা কতকগুলি মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ভারতে বক্তৃতা—১৮৯৭)।

দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর কোন ধর্ম বা দর্শনের বিবাদ-বিসংবাদ নাই।....বেদান্তের অভিমত এই যে, প্রত্যেক মানুষ যতটুকু ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেদিক হইতে বিচার না করিয়া, তাহার স্বরূপের দিক হইতেই তাহাকে বিচার করিতে হইবে।....বেদান্তের অপর একটি বিশিষ্ট-ভাব এই যে,—ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই অসীম বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এবং সকলেরই লক্ষ্য এক বলিয়া, সকলকেই একই মতে আনিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইবে। [উল্লেখ্য গীতার বাণী—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ'॥ (৪/১১)—হে পার্থ! যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ যে-পথই অনুসরণ করুক না কেন [জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে] আমার দিকেই চলিয়াছে।

প্রকৃত বৈদান্তিক কে ?

মানুষ যখন তাঁর বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদই তাঁর নিকট প্রতিভাত হয় না; যখন সে এই সকল ভেদ-বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎলাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র এইরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৪)।

বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর

বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন (কারণ, বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তেরই একটি শাখামাত্র)। আর, শঙ্করকেও কখন-কখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয় (৪৩)। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন, শঙ্কর সেগুলির সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করেন। (Inspired talks—আমেরিকা)।

---

(৪৩) কেবল 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' কেন? বৈদান্তিক দ্বৈতবাদী বা পরিণাম-বাদীগণকে এমনও বলিতে শুনা যায়ঃ—

মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। বুদ্ধদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়াই অধঃপতিত হইয়াছিল এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে (অর্থাৎ আচার্য শঙ্করের প্রচারের ফলে) সকল বৌদ্ধেরাই আবার তাহাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এতদিনে যে-সকল অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলির সম্বন্ধে যে কি হইবে, ইহাই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। (মাদ্রাজে বক্তৃতা—১৮৯৭)।

বুদ্ধদেবের মধ্যে ছিল মহান্ সর্বজনীন হৃদয়—অনন্ত সহিষ্ণুতা; যার ফলে তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এবং দ্বারে-দ্বারে গিয়া উহা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। [অন্যদিকে] শঙ্করাচার্যের বেলায় দেখা যায় এক প্রচণ্ড ধীশক্তি, যাহা প্রখর যুক্তির আলোকে সবকিছুকেই উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা চাই—শঙ্করের এই অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানসূর্যের আলোক বুদ্ধের অদ্ভুত প্রেম ও করুণাপূর্ণ হৃদয়বৃত্তির সহিত যুক্ত হোক! এইরূপ সংযোগের ফলেই মহত্তম দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইবে—বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের সহিত

... ... বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় সে নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক।
জীবনিস্তার হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।

* * *

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥ চৈঃ চঃ মধ্যঃ।

কিন্তু ইহাসত্ত্বেও বলিতে হয়, নাগার্জুনাদি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের প্রচারিত অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ তথা শূন্যবাদের পরিপেক্ষিতে, আচার্য শঙ্করের 'বিবর্তবাদ' অপেক্ষা উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মবাদের অধিকতর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা বা ভাষ্য অন্য আর কিছু ছিলনা বা হইতেও পারেনা।

কোলাকুলি করিবে—কাব্য ও দর্শনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে; এবং উহাই হইবে ভবিষ্যতের ধর্ম। আর যদি আমরা উহাকে ঠিকমত গড়িয়া তুলিতে পারি, তবে একথা নিশ্চিত যে, উহাই হইবে সর্বকালের ও সর্বজাতির পক্ষে উপযোগী ধর্ম।

জ্ঞান ও আনন্দব্যতীত সত্তা কখনও থাকিতে পারেনা। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান, এবং জ্ঞান ব্যতীত প্রেমও থাকিতে পারে না (৪৪)। আমরা চাই—সকল বিষয়েরই সমভাবে উন্নতি। শঙ্করের মেধার সহিত বুদ্ধের হৃদয় লাভকরা সম্ভব [অর্থাৎ এইরূপ ভাবনা কেবল কল্পনাবিলাসমাত্র নহে]। আশাকরি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। (লণ্ডনে বক্তৃতা—১৮৯৬)।

বুদ্ধের ঐতিহাসিকতা ও আবির্ভাবকাল

[প্রাচীন] ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবলমাত্র বুদ্ধ ও মহম্মদই স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্তারূপে দণ্ডায়মান, কারণ সৌভাগ্যক্রমে উঁহারা জীবদ্দশাতেই শত্রুমিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। [অর্থাৎ উভয় পক্ষের প্রদত্ত বিবরণ হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের সুযোগলাভ হইয়াছে]। (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা)।

.......অতঃপর ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায়ের সুরু হইয়া গেল! গীতায় আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দূরাগত অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পাই। শুধুমাত্র ধর্মমত লইয়াই নহে, সম্ভবতঃ ইহা ছিল বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত। আমাদের সমাজের দুইটি প্রবল অঙ্গ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বিবাদ সুরু হইয়া গিয়াছিল। এরপর সহস্র বৎসর ধরিয়া যে প্রবল তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, উহার শীর্ষদেশে আমরা দেখিতে পাই আর এক মহামহিম মূর্তিকে। ইনিই আমাদের গৌতম শাক্যমুনি।....আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। এত বড় নির্ভীক—এমন সুমহান-নীতিতত্ত্বের-

(৪৪) বলাবাহুল্য, এখানে ভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্বেরই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রচারক জগতে আর জন্মায়নি। কর্মযোগীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজেই নিজের শিষ্যরূপে, আপন সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে উহা শিখাইবার জন্য আবারও আবির্ভূত হইলেন।...গীতার সেই সকল বাণীর জীবন্ত-উদাহরণরূপে—উহার একাংশও যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, সেজন্য স্বয়ং সেই গীতা-উপদেষ্টাই যেন অন্যরূপে আবার ধরাধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি—দীন দুঃখীগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যই যাঁর আবির্ভাব। যাহাতে তাঁর বাণী সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়, সেজন্য দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের কথ্যভাষাতেই তিনি তাঁর বক্তব্য প্রচার করিতে লাগিলেন,—দুঃখী দরিদ্র ও পতিত ভিক্ষুকদের সাথে বাস করিবার অভিপ্রায়ে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন, এবং দ্বিতীয়-রামের মতোই চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। (মাদ্রাজে বক্তৃতা—১৮৯৭)।

[পূর্বতন মত পরিত্যক্ত হওয়ার পরে, রাম ও কৃষ্ণ, তথা গীতার বুদ্ধ-পূর্ববর্তিতা সম্বন্ধে স্বামীজীকে এইভাবে আরও বলিতে শোনা যায়]।

শ্রীকৃষ্ণারাধনা বুদ্ধ-আরাধনা অপেক্ষা অতি প্রাচীন (৪৫)। বুদ্ধ-পরবর্তী যে-কোন গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না।...গীতার মধ্যে কে সে-প্রকার [বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কোন উল্লেখ] দেখাইতে পারেন? পুনশ্চ গীতায় সর্বধর্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে; ইহাতে কোন মতেরই অনাদর করা হয় নাই। [সে-ক্ষেত্রে] একমাত্র বৌদ্ধমতই গীতাকারের সাদর-উল্লেখ থেকে বঞ্চিত হইল কেন? গীতায় কাহাকেও ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞা করা হয় নাই। আর

---

(৪৫) দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে পৌরাণিক যুগারম্ভে হিন্দুধর্ম ও সমাজে কৃষ্ণারাধনা প্রবর্তিত হয়। অন্যপক্ষে, ইহার বহু পরে আসিয়া বুদ্ধ হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই কৃষ্ণকে পূর্ববর্তী এবং বুদ্ধকে পরবর্তী অবতাররূপে বলা হইয়া থাকে, ঐতিহাসিকতা কিংবা আবির্ভাবকালের বিচারে নহে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থপরিশিষ্টে আলোচনাটি দ্রষ্টব্য।

ভয় ? গীতায় উহারও একান্ত অভাব। স্বয়ং বেদপ্রচারক হইয়াও, যে-ভগবান প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈদিক হঠকারিতাকেও কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিতে কুণ্ঠিত নন, তাঁর আবার বৌদ্ধমতের ভয় কী ? (প্যারী-প্রদর্শনীতে বক্তৃতা—১৯০০)। [গ্রন্থপরিশিষ্টে আলোচনাটি দ্রষ্টব্য]।

আমার মতে বৌদ্ধধর্মের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, মহাযানসম্প্রদায়ই পূর্বতর (৪৬)।....শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদখানিকে অন্ততঃ বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী বলিয়াই আমার দৃঢ় ধারণা। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেও কোন না-কোন ভাবে শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল। অগ্নিপুরাণে গয়াসুরের কাহিনীটি আদৌ বুদ্ধসম্বন্ধীয় নয় ; (বুদ্ধ যে একদা গয়াশীর্ষ পর্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন—উহাদ্বারাই স্থানটির বুদ্ধ-পূর্ববর্তিতা সপ্রমাণিত হয়)। বুদ্ধের পূর্ব হইতেই গয়া পিতৃপুরুষের পূজাস্থলরূপে খ্যাত ছিল, এবং বৌদ্ধেরা হিন্দুদের নিকট হইতেই [পরবর্তিকালে] পদচিহ্নের পূজা শিখিয়াছে। [এখানে স্বামীজীকে, 'মোক্ষমার্গই একমাত্র ধর্মপথ' এরূপ নির্দেশকারী গৌতমবুদ্ধই যে গয়াসুর—এইরূপ পূর্বমত পরিত্যাগ করিয়াই, এরূপ বলিতে শোনা যায়] (১৯০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত পত্রাংশ দ্রষ্টব্য।]

ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও উহার কারণ

বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণীই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তগ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুকায়িত সত্যগুলিকে যাঁহারা সকলের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধ ছিলেন সেই-সকল সন্ন্যাসীগণেরই অন্যতম। অবশ্য আমি বিশ্বাস করিনা যে, জগৎ এখনও এই সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত। লোকে এখনও ধর্মের নিম্নতর-অভিব্যক্তিগুলিই চায়—সেখানে ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম

(৪৬) বুদ্ধের দেহত্যাগের পরেই বৈশালীসম্মেলনে যে 'মহাসাঙ্গিক' গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, উহাই পরে 'মহাযান' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছিল। মনে হয়, একদিক দিয়াই এখানে 'মহাযানকে' ('হীনযান' অপেক্ষা) পূর্বতর বলা হইয়াছে।

জনগণের চিত্তকে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই (৪৭)। (আমেরিকায় বক্তৃতা—১৮৯৫)।

অত্যধিক গ্রহণ-প্রবণতার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের চরম আগ্রহের ফলে, কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যাহাতে, যে-মূলধর্ম [অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্ম] হইতে উহার উদ্ভব তাহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিযোগীতা করা উহার পক্ষে আর সম্ভব ছিলনা। [অন্যদিকে] বৈদিক-সম্প্রদায়ও ইতোমধ্যে পশুবলি প্রভৃতি বহু অবাঞ্ছিত আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বিনী কন্যার' নিকট হইতে কি করিয়া যে বিশেষ বিবেচনার সাথে মূর্তিউপাসনা, মন্দিরের শোভাযাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় সে-বিষয়ে যথোচিত শিক্ষালাভ করিয়া, পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের সমগ্র সাম্রাজ্যকেই এককালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল (৪৮)। (Historical Evolution of India—স্বামীজীর নিজস্ব রচনা)।

দুঃখের বিষয়, বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ফলে যে-সকল বিভিন্ন বর্ব্বরগোষ্ঠী দলে-দলে আর্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে বুদ্ধ-প্রচারিত অত্যুচ্চ আদর্শগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। এই সকল গোষ্ঠী দ্রুতবেগে আর্যসমাজে প্রবেশকালে তাহাদেব নানাবিধ

---

(৪৭) কোন্ মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই যে উপনিষদ-যুগের পরে বৌদ্ধযুগ, এবং উহার পরে পুরাণযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল, স্বামীজীর কথা-গুলিতেও এখানে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। আমাদের পরবর্তিকালের শাস্ত্রকারগণও অবস্থার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, উহার ফলে পুরাণসকলের সৃষ্টি, এবং অবতারবাদ ও আরও পরে একান্ত ব্যক্তিনির্ভর গুরুবাদ প্রভৃতিরও উদ্ভব হইতে দেখা যায়। এবিষয়ে গ্রন্থপরিশিষ্টেও প্রসঙ্গক্রমে কিছু-কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪৮) এইভাবেই পৌরাণিক যুগের আরম্ভ; এবং কালক্রমে বুদ্ধকে হিন্দুধর্মে অবতাররূপে স্বীকৃতির পথ প্রস্তুত হইতে দেখা যায়।

কুসংস্কার ও বীভৎস উপাসনা-পদ্ধতিগুলিও সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য বোধ হইল, তাহারা যেন সত্য-সত্যই সভ্য হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু এক শতাব্দী যাইতে না যাইতেই, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের সর্প ভূত প্রভৃতির উপাসনা চালু করিয়া ফেলিল। এইরূপে সমগ্র ভারত একটি নীচ কুসংস্কারসমূহের লীলাভূমিতে পরিণত হইল। সর্বপ্রাণীতে দয়া, উচ্চ নীতিতত্ত্ব, নিত্য-আত্মা বলিয়া কোনো কিছু আছে কিনা, উহা লইয়া চুলচেরা বিচার-বিতর্ক সত্ত্বেও, সমগ্র বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল ; এবং চূর্ণ হইবার পরে উহার যে ভগ্নাবশেষ, তা ছিল, অত্যন্ত বীভৎস। (মাদ্রাজে বক্তৃতা—১৮৯৭)।

প্রত্যেক আন্দোলনই উহার কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্যই জয়যুক্ত হয়। কিন্তু উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তার গৌরব, উহাই তার দুর্বলতার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ একজন অত্যদ্ভুত সংঘ-সংগঠক ছিলেন। ঐ শক্তির বলে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন (৪৯)। কিন্তু তাঁর ধর্ম কেবল সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়েরই ধর্ম ছিল ; যার ফলে সন্ন্যাসীর ভেখমাত্রকেও সবিশেষ সম্মানের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। এছাড়া, তিনিই সর্বপ্রথম সকলে একসঙ্গে ধর্মসংঘে বাস অর্থাৎ মঠপ্রথা প্রবর্তীত করেন ; যেজন্য তাঁহাকে একরূপ বাধ্য হইয়াই স্ত্রীগণকে পুরুষের কর্তৃত্বাধীন করিতে হইয়াছিল। অতিবড় একজন মঠাধ্যক্ষারও নির্দিষ্ট কোনো মঠাধ্যক্ষের বিনানুমতিতে গুরুতর কোনো কিছুই করিবার অধিকার ছিল না। ইহাতে সাময়িকভাবে উদ্দিষ্ট ফসলাভ অর্থাৎ ধর্মসংঘে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু

---

(৪৯) বুদ্ধের এইরূপ সংগঠন-শক্তি ও পদ্ধতি স্বামীজীকে এতটাই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে লিখিত একখানি পত্রে মঠের ভাবী কার্যনির্বাহক সদস্য-নির্বাচন প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়—'All Office-bearers should be elected by ballot, as was the mandate of Lord Buddha. (C/w : P. VII).

উহার ভবিষ্যৎ ফলের কথা ভাবিলে অনুশোচনাই করিতে হয়। (প্রবুদ্ধ-ভারতের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার—১৮৯৮)।

বুদ্ধের শিক্ষার কোনরূপ ত্রুটির জন্যই বৌদ্ধধর্মের এরূপ অধঃপতন ঘটে নাই। তাঁর অনুগামীগণের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছিল। অতি-মাত্রায় দার্শনিকভাবাপন্ন হইয়া পড়ায় তাহারা তাহাদের অন্তরের প্রসারতা অনেকটাই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এরপর ক্রমে-ক্রমে তাহাদের মধ্যে 'বামাচার' (লোকপ্রচলিত অর্থে ধর্মের নামে অবাধ স্ত্রীসঙ্গ) আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল এবং উহার ফলে বৌদ্ধধর্মের সর্বনাশ ঘটিল (Conversations & Dialogues : স্বামীশিষ্য-সংবাদ)।

বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ভারতবাসীকেই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলে তো আর তা হ'তে পারে না। এইভাবে যে-সে ভিক্ষু হওয়াতে তাদের ভেতর ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কমে আস্‌তে লাগ্‌লো। আর এক কারণ, ধর্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্বর আচার-ব্যবহারের অনুকরণ। ঐ সব জায়গায় ধর্মপ্রচার কর্‌তে গিয়ে, তাদের [প্রচারকদের] ভেতর ওদের দূষিত সব আচারগুলো ঢুক্‌ল। তারা শেষে ভারতে সেগুলো চালিয়ে দিলে। (প্রশ্নোত্তর—১৮৯৯)।

ভারতের বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় উহার কয়েকটি মৌলিক নীতিকে হিন্দুধর্ম নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। এগুলিই এখন বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত। বৌদ্ধদের 'অহিংসা পরম ধর্ম' নীতিটি (৫০) খুবই ভাল বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার না করিয়া কেবল আইনের বলে সকলের উপরেই এটিকে চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টার ফলে, বৌদ্ধধর্ম ভারতের প্রচণ্ড ক্ষতি করিয়াছে। আমি ভারতে এমন অনেক বকধার্মিককে দেখিয়াছি যাহারা পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায়, কিন্তু তুচ্ছ অর্থের লোভে নিজের ভাইয়ের সর্বনাশ করতেও ইতস্ততঃ করেনা। (Conversations & Dialogues—স্বামীশিষ্য-সংবাদ)।

---

(৫০) 'অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে'—নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত কিংবা হত্যা করিবেনা—বৌদ্ধ ধম্মপদ।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের প্রতি আহ্বান

এবারে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো-ধর্মসভায় ষোড়শ দিনের অধিবেশনের শেষে উপস্থিত বৌদ্ধগণকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীজীকে যাহা বলিতে শোনা যায়, উহার সারাংশের উল্লেখ করিয়াই প্রসঙ্গটি শেষ করা যাইতেছে—

'হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম [illegible] যেমন হিন্দুধর্ম বাঁচিতে [illegible] না, তেমনি হিন্দুধর্ম ব্যতীতও [illegible] ব্রাহ্মণদের [illegible] দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না [illegible] বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারে [illegible] আবার বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে ব্রাহ্মণের [illegible] দাঁড়াইবার স্থান [illegible] ও ব্রাহ্মণের বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের [illegible] ভারতবর্ষ ত্রিংশকোটি ভিক্ষুকের [illegible] — [illegible] ভারতবাসী সহস্র বৎসর ধরিয়া [illegible] অতএব আসুন! আমরা [illegible] লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, [illegible] সংযোগসাধন করিয়া দিই!'

[এরপর একে-একে [illegible] ([illegible]) অতীত হইয়া গিয়াছে। [illegible] ইতোমধ্যে স্বামীজীর [illegible] জগৎসভায় মর্যাদার সহিত স্থানও [illegible] বলিতে হয়,—স্বামীজীর [illegible] আহ্বান [illegible] আগেও যেমন ছিল, [illegible] 'ব্রাহ্মণের' বেলাতেই নয়, আমাদের [illegible] সকল ক্ষেত্রেই, ধীশক্তির সাথে হৃদয়বত্তার [illegible] নির্ভর করিতেছে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল [illegible]— যাহাকিছু প্রকৃত কল্যাণ!—গ্রন্থকার]

—০—

পরিশিষ্ট

বুদ্ধের আবির্ভাবকাল ও উহার তাৎপর্য (১)

এই প্রসঙ্গে আমাদের যে মুখ্য আলোচ্য-বিষয়টি, অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মহাভারত তথা গীতা-পূর্ববর্তী ছিলেন কিনা, সে-সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলিতে যাওয়া বোধহয় আদৌ সম্ভবপর নহে। কেবল আমাদের দেশেরই কেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও এবিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণচরিত্রকার বঙ্কিমচন্দ্রকে ১৪৩০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দকেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল বলিয়া নির্দেশ করিতে শুনা যায়। অর্থাৎ তাঁহার মতানুযায়ী বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় ৮।৯ শত বৎসর পূর্বেই মহাভারতের তথা গীতার উদ্ভব হইয়াছিল। তবে যে জ্যোতিষগণনার উপর ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ সিদ্ধান্ত, অনেকের মতে উহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। স্বামী বিবেকানন্দকেও, পূর্বমত পরিত্যাগের পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারি-প্রদর্শনীতে গীতার বুদ্ধ-পূর্ববর্তিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিতে শুনা যায়—"শ্রীকৃষ্ণারাধনা বুদ্ধ-আরাধনা অপেক্ষা অতি প্রাচীন। বুদ্ধ-পরবর্তী যে কোন গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না।....গীতার মধ্যে কে সে-প্রকার দেখাইতে পারেন? পুনশ্চ গীতায় সর্বধর্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে; ইহাতে কোনো মতেরই অনাদর করা হয় নাই। একমাত্র বৌদ্ধমতই গীতাকারের সাদর উল্লেখ থেকে বঞ্চিত হইল কেন?" ইত্যাদি। অপরপক্ষে, যাঁহারা অন্যরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাভারত সম্বন্ধে সুপণ্ডিত Hopkins সাহেবকে মনে করিতে দেখা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ হইতে ৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মহাভারত রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার মতে, বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় দুইশত বৎসর পরে মহাভারত

(১) পূর্বে কোনো এক সময়ে এই একই শিরোনামে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকা-খানিতে প্রকাশিত প্রবন্ধটিই এবারে এইভাবে পরিবর্তিতাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল।

রচনার সূত্রপাত হয়। অবশ্য এইরূপ রচনার কথাতে ইহাও বলিতে হয় যে, ঘটনার কাল হইতে রচনার কাল যে কখনও-কখনও বহু পরবর্তী হইতে পারে, সে কথাটাও অনস্বীকার্য। সে যাহাহোক, কোন-কোন আধুনিক পণ্ডিতগণও যেরূপ মনে করেন তাহাতে, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার পাণিনী ও যোগসূত্রপ্রণেতা ঋষি পতঞ্জলির জন্ম হইয়াছিল ; এবং মহাভারতোক্ত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতিও সম্ভবতঃ ঐ সময়েরই (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকীতে বুদ্ধের জন্মের পরবর্তী) ঘটনা। এই প্রসঙ্গে, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কোন-একখানি গ্রন্থ হইতেও আলোচ্য বিষয়ে কিছু উদ্‌ধৃতি দেওয়া গেল—"অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এদেশের জ্ঞানী সাধকদের মধ্যে সন্ন্যাসমার্গের প্রতি আগ্রহ প্রবল হ'য়ে ওঠার ফলেই একদা এদেশে লোকস্থিতি বিপন্ন হয়ে প'ড়েছিল এবং লোকসংগ্রহের কথা মনে রেখেই পরবর্তিকালে ধর্মের এক সর্বাঙ্গীণ রূপকল্পনা করেছিলেন গীতাকার। কারণ, গীতাতেই আমরা এক সুপরিণত ও সম্পূর্ণাঙ্গ ধর্ম পাই, যা বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভূত নৈতিক আদর্শকে সমন্বিত ক'রেছে এক কর্মযোগশাস্ত্রে...."(২)।

ইহার পরে এবিষয়ে গ্রন্থখানিতে আরও বলিতে শুনা যায়—"আদর্শমানব বুদ্ধকে মনে রেখেই যে একদিন গীতাপ্রবক্তা কৃষ্ণের কল্পনা করা হইয়াছিল, সীতানাথ তত্ত্বভূষণের এ অনুমান অমূলক না হ'তে পারে ;" [পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের এবিষয়ে যে দুইখানি গ্রন্থ, দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমাদের পক্ষে উহা দেখিবার সুযোগ হয় নাই]।

ইহা ভিন্নও, ভারতগভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 2500 years of Buddhism গ্রন্থখানির Later Modifications of Buddhism অংশটির জনৈক লেখককেও বুদ্ধের গীতা-পূর্ববর্তিতা সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে শুনা যায়। প্রধানতঃ গীতোক্ত যুক্তাহার-বিহার, চতুর্বিধ অন্ন অসৎকর্মত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত বুদ্ধের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উক্তির

(২) ধর্ম্মপদ—হরফ প্রকাশনী : ভারতের ধর্মসাধনা ও গৌতমবুদ্ধ—শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়।

যে সাদৃশ্য দেখা যায়, উহার ভিত্তিতেই লেখক বুদ্ধকে গীতা-পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের যেরূপ মনে হয় তাহাতে বলিতে হয়—কেবল হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেই কেন, জগতের অন্যান্য ধর্মমত ও পথেও কোন-না-কোন ভাবে এই জাতীয় বিধি-নিষেধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই, এই সকল লক্ষণের দ্বারা উহাদের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করিতে যাওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। ইহা ভিন্ন, এই প্রসঙ্গে লেখকের অন্য একটি উক্তি সম্বন্ধেও কিছু কথা [illegible] পড়ে। [illegible] গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের যে-প্রথমাংশ '[illegible] দোষবদিত্যেকে [illegible] প্রাহুর্মনীষিণঃ', বৌদ্ধ শাস্ত্র [illegible] উহার ব্যাখ্যা [illegible] যেরূপ [illegible]—'S[illegible]me wise men say that the wrongful [illegible] abandoned'—উহাকে কোন ক্রমে শ্লোকটির [illegible] অর্থ বলা চলিতে পারে না। [illegible] প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য [illegible]—কোন-কোন পণ্ডিতেরা ([illegible] পণ্ডিতগণ) বলিয়া [illegible]—'কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব পরিত্যাজ্য'। [illegible] বিষয়ে গীতার সহিত বৌদ্ধ অথবা [illegible] অপেক্ষা [illegible]

(২)

যাহাহোক, এই [illegible] যে আমরা গৌতম-বুদ্ধকে গীতা-[illegible] বলিয়াছি, গীতা-পূর্ববর্তী বলিয়াই অনুমান করি, তাহার কারণ [illegible] গিয়া একারে অন্যান্য কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র গীতা, মহাভারত ও বৌদ্ধ ধম্মপদাদি সম্বন্ধে কিছু-একটু আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি। তবে তৎপূর্বে এরূপ আলোচনার সার্থকতা বা কার্যকারিতা সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিতে গিয়া, বলিতে হয়,—কেবলমাত্র ভারতেরই নহে, জগতের সকল বিশিষ্ট ধর্মমতকেই একটিকে অপরটির পরিপূরক বা প্রতিক্রিয়ারূপেই আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে, খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে যিশুখৃষ্টের যে-উক্তিটি—

"I have come to fulfil and not to destroy"—উহাকে কেবলমাত্র খৃষ্টানধর্মের কথাই বলা চলেনা। একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহা বস্তুতঃ সকল ধর্মেরই—সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণের পক্ষেই একটি মূলকথা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং সেদিক দিয়া সকল ধর্মমত ও পথকে 'সূত্রে মণিগণা ইব' এক চরম ও পরম সত্য বা লক্ষ্যের দ্বারা পরস্পর বিধৃত বলিতে হয়। আমাদের ধর্মশাস্ত্রেরও অবতারবাদ, ধর্মসংস্থাপন ও যুগধর্মপ্রবর্তন প্রভৃতি যে-সকল কথা, সে-সকলেরও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ধর্মকর্ম বিষয়ে এইরূপ fulfilment বা পূর্ণতাসাধন। কাজেই, একথা বোধহয় অনস্বীকার্য যে, প্রয়োজনারূপ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শ্রদ্ধার সহিত বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের ক্রমবিকাশের ধারার পর্যালোচনা করিতে পারিলে, উহার ফলে উহাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান ও সেই সঙ্গে আবির্ভাবকালের পৌর্বাপর্য-নির্ণয়ও অনেকাংশে সহজসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপ ধারণাই আমাদিগকে আলোচ্যবিষয় নির্বাচনে উৎসাহিত করিয়াছিল, এবং ইহারই বশবর্তী হইয়াই আমরা অতঃপর এ বিষয়ে সাধ্যমতো কিছু-একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(৩)

প্রথমে গীতার কথাতেই বলিতে হয়,—সমগ্র মহাভারতখানি ও সেই সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও যদি বস্তুতঃ বুদ্ধোত্তর কালেই রচিত কিংবা সংকলিত হইয়া থাকে, তবে উহাদের মধ্যে কোথায়ও-না-কোথায়ও প্রত্যক্ষভাবেই হোক, আর পরোক্ষভাবেই হোক্, বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু-না-কিছু উল্লেখ খুঁজিয়া পাওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এদিক দিয়া সেই উদ্দেশ্যে গীতার উক্তিসকলের আলোচনা করিতে গিয়া সর্বপ্রথম ২য় অধ্যায়ের ২য় শ্লোকটিতে যে 'অনার্য্যজুষ্টম' কথাটি চোখে পড়িয়া যায়, উহাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই মনে করিতে হয়। যুদ্ধ করিতে আসিয়াও, যুদ্ধ করিবনা বলিয়া বিষণ্নচিত্ত অর্জুনকে ধনুর্বান ফেলিয়া দিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়াই কথাটি বলিতে শুনা যায় শ্রীকৃষ্ণকে। কেন এই ভৎর্সনা?

বস্তুতঃ ব্যাপারটি এরূপ না হইলে, কুরু-পাণ্ডবদের যে-শত্রুতা বা জ্ঞাতিযুদ্ধ, উহা যতই ভয়ংকর এবং উহার ফল যতই সুদূরপ্রসারী হোক্ না কেন, উহাকে কখনও ব্যাপক ধর্মগ্লানি বা অধর্মের অভ্যুত্থান বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলিতে পারেনা, যেজন্য কৃষ্ণের ন্যায় কোনো একজন অবতার-পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইতে পারে।

(৪)

এবারে ৩য় অধ্যায়ের যে-শ্লোকটি—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্॥

'জ্ঞানী ব্যক্তিরা কদাচ কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ (বুদ্ধিভ্রংশ) ঘটাইবেন না। [বরং] নিজেরা অনাসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে (স্ব-স্ব) কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন'—সে-সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিতে গিয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—এই-যে উক্তিটি, এটি কি প্রকৃতপক্ষে গীতাকারের অন্যনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই ফল, অথবা এটিকে তাঁহার অতীত অভিজ্ঞতা কিংবা ঐতিহাসিকদৃষ্টি-প্রসূত বলিয়াই বলিতে হইবে? এবং সেই অবকাশে মনে পড়িয়া যায় গৌতমবুদ্ধের জীবদ্দশায় এরূপ বুদ্ধিভেদের কয়েকটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের কথাটিও।

বুদ্ধ তখনও সশরীরে বর্তমান। এমন সময়ে একদিন, আপামর-সাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের ত্যাগব্রত প্রচারের ফলে (নির্বাণলাভের আশাতেই হোক্, আর ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি-লাভের উদ্দেশ্যেই হোক্) একদল লোক হঠাৎ ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া বসিল। মহাজনেরা প্রমাদ গণিল; ভীত হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিতেই, অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়া লইয়া, বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দেওয়া অনুচিত।' এইভাবে অন্য একদিন দাসগণও, দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের আশায় ভিক্ষু হইতে আরম্ভ করিলে, বুদ্ধ আদেশ করিলেন—'ভিক্ষুগণ! কোনো দাসকে কখনও প্রব্রজ্যা দিবেনা।' ইহার পর যখন রাজ-সৈন্যেরাও যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দলে-দলে সন্ন্যাসী হইতে লাগিল, তখন রাজা

বিম্বিসার ভয় পাইয়া বুদ্ধের শরণ লইতেই, তাঁহাকে আবারও আদেশ দিতে হইয়াছিল—'হে ভিক্ষুগণ! রাজ-সৈনিকগণকে কদাচ ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করিবেনা।'

কাজেই এরূপক্ষেত্রে যদি কেহ বলিতে চাহে যে, বুদ্ধজীবনের এই সকল ঘটনার পরিপেক্ষিতেই পরবর্তিকালে কৃষ্ণকে গীতায় আলোচ্য নির্দেশটি দিতে হইয়াছিল, তবে সে-কথাটিকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলেনা নিশ্চয়ই।

অনন্তর এই ৩য় অধ্যায়েরই অন্য একটি শ্লোকের কথা—

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

অর্থাৎ কিনা, স্বধর্ম যদি কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও হয়, তবুও তাহা উত্তমরূপে-অনুষ্ঠিত পরধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে থাকিয়া মরণও মঙ্গলকর; কিন্তু পরধর্মকে ভয়ের আকরস্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে।

এইযে এখানে 'স্বধর্ম্ম' ও 'পরধর্ম্ম' কথাদুইটি, এ সম্বন্ধে বহুপ্রকার ব্যাখ্যাই প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু, ইহাদের অর্থে যদি লৌকিকভাবে, একদিকে বৈদিক কিংবা পরবর্তিকালের ক্রিয়াকাণ্ডমূলক ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দুধর্মকে, এবং অন্যদিকে উহা হইতে পৃথক কোনো ধর্মকে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে—একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন, গীতার সমসাময়িক-কালে কিংবা উহার পূর্বেও, এমন আর কোন ধর্মের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে, যাহা কিনা হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এইভাবে এখানে কথাগুলির লক্ষ্যস্থল হইতে পারে? ইহার পরে, 'বিগুণঃ' ও 'স্বনুষ্ঠিতাৎ' শব্দদুইটির অর্থেও, একপক্ষে বৈদিক ধর্মের অবনতির যুগে উহার যজ্ঞার্থেপশুবধ, বর্ণভেদ, ও পুরোহিতকুলের একাধিপতা প্রভৃতি দোষ, এবং অন্যপক্ষে নবোদ্ভূত বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, সর্বজনীনতা, ও লোককল্যাণচিকীর্ষাদি সদ্‌গুণের কথাটাই মনে আসিয়া যায় না কি?

(৫)

পরে ৪র্থ অধ্যায়ে আসিয়া যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে যে-সকল আলাপ-আলোচনা, উহাদিগকেও কী বুদ্ধকর্তৃক বৈদিক যজ্ঞাদি ও ক্রিয়াকাণ্ডের

নিন্দারই প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যুত্তর বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না? অন্যদিক দিয়া আবার, পরের অধ্যায়টিতে কর্মযোগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি, সামাজিক দিক হইতে উহাদের তাৎপর্যের কথায় বলিতে হয় যে, গীতা বা মহাভারত-রচনার সমকালে কিংবা উহার অনতিকাল পূর্বে ও পরেও হিন্দুধর্ম ও সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ ও সংসারত্যাগের যে-ব্যাপক প্রেরণা বা মানসিক যুক্তি-বোধের উদ্ভব হইতে দেখা যায় (৩), উহারই প্রতিকার বা প্রতিরোধই ছিল কথাগুলির লক্ষ্য। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, হিন্দুধর্ম ও সমাজে এইকালে সহসা এরূপ সংসারবৈরাগ্য বা গৃহস্থাশ্রমত্যাগের প্রবল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? ভারতের মহাকাশে এমন কোন অদৃষ্টপূর্ব গ্রহের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাহার আকর্ষণে পড়িয়াই এইভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সমাজ অনেকাংশে তাহার পূর্বতন যাগযজ্ঞবহুল ও বর্ণাশ্রমের কক্ষপথ ত্যাগ করিয়া অতঃপর নূতন পথে ধাবিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল? উত্তরে, আবারও একবার হিন্দুধর্মেরই 'বিদ্রোহী সন্তান' গৌতমবুদ্ধের জন্ম ও বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাতের কথাটাকেই স্মরণ করিতে হয়না কি?

(৬)

এবারে নবম অধ্যায়ের দুইটি শ্লোক লইয়াও কিছু-একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। এই দুইটির, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোক দুইটির সহিত সপ্তম অধ্যায়ের ২৪ ও ষোড়শ অধ্যায়ের ৭ম হইতে

---

(৩) দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ্য, মহাভারতে জরৎকারু মুনির উপাখ্যানটি ও সেইসঙ্গে গীতার ২য় অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনের উক্তিটি—'গুরূনহত্বা হি মহানুভবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।' অর্থাৎ, মহানুভব গুরুগণকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণও শ্রেয়; এবং উহার পরেও মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের পূর্বে আবারও একবার তাঁহাকে যেরূপ বলিতে শুনা যায়—'ক্ষাত্রধর্মে ধিক! হায়! আমি এ-ধর্মের অনুবর্তী হইয়াই সমুদয় বন্ধু-বান্ধবকে কালকবলে প্রেরণ করিলাম' ইত্যাদি।

পরপর কয়েকটি শ্লোককে একত্রিত করিয়া দেখিলে, যে-সকল 'নিরীশ্বরবাদী' ও 'অসুরপ্রকৃতি' ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় (যাহাদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে—উহারা সগুণ বা নির্গুণ কোনরূপ ঈশ্বরেই আস্থাবান ছিলনা, এবং ঈশ্বরের অবতারবাদের প্রতি ছিল তাহাদের চরম অবজ্ঞা। উহারা এমনও বলিত যে, এজগতে সত্য বলিয়া কোনকিছু নাই, সকলই অসত্য। উহাদের মতে, জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কোন-কেহ নাই ; এজগৎ কেবল স্ত্রীপুরুষের কামজসংসর্গজাত। ইহার আর অন্য কোন হেতু নাই।···· জগতের বিনাশের জন্যই যেন ইহাদের উদ্ভব।)—উহারা বস্তুত কাহারা, বা কোথা হইতে আসিয়াছিল ? বলা বাহুল্য, ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন-কাহারও পক্ষে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমাত্রকেই এইভাবে 'অসুরপ্রকৃতি-সম্পন্ন' কিংবা 'জগতের বিনাশের জন্য উদ্ভূত' বলাটা আদৌ কিছু বিচিত্র নহে। কাজেই এ অবস্থায়, এই দুইটি কথাকে বাদ দিলে, গীতোক্ত শ্লোকে অন্যান্য যাহাকিছু বলিতে শুনা যায়, উহার সহিত পূর্বপরম্পরাক্রমে-আগত চার্বাকদর্শনের জড়বাদ ও বৌদ্ধদর্শনের অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ প্রভৃতির বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। এবং সেদিক দিয়া বিচার করিলে, গীতার এই সকল উক্তিদ্বারা কেবলমাত্র চার্বাকের জড়বাদ বা 'লোকায়ত দর্শনের'ই নহে, সেইসঙ্গে বৌদ্ধধর্মেরও অস্তিত্ব ও পূর্ববর্তিতাও যে সূচিত বা স্বীকৃত হইয়াছে, এরূপ মনে করাটাকে বোধহয় কোনক্রমেই অযৌক্তিক বলিতে পারা যায় না। [প্রসঙ্গক্রমে, মূল গ্রন্থখানিতে বৌদ্ধধর্মে শূন্যবাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-উক্তিগুলি, উহার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা যাইতেছে]।

ইহার পর, এই যে-সব ভিন্ন মত ও পথের লোকেরা, ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, সে-কথায়ও উল্লেখ্য স্বামীজীর উক্তিটি—'তিনি (গৌতম বুদ্ধ) ৮০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং অর্ধেক দেশকে তাঁহার ধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন।' অন্যদিকে আবার যেমন দেখা যায় তাহাতে বলিতে হয়—বুদ্ধের, এমনকি গীতার কাল পর্যন্তও, এদেশে যবন বা

শক-হুণাদির অনুপ্রবেশ ঘটিয়া ওঠে নাই। কাজেই, ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, এখানে গীতায় যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, কিংবা আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রপুরাণেও যে-সকল দৈত্য-দানবের পরিচয় পাওয়া যায়, উহাদের প্রায় সকলেই (আর্যই হোক্ বা অনার্যই হোক্) এদেশেরই স্থায়ী অধিবাসী ছিল ; এবং সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়, উহারাও সেইভাবে একদিন আর্য বা হিন্দু সমাজঅঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া, কালক্রমে আবার বৃহত্তর ভারতীয় সমাজভুক্তই হইয়া পড়িয়াছিল।

অনন্তর এই অধ্যায়েরই পরের যে-শ্লোকটি—

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনযঃ।

স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তে ঽপিযান্তি পরাং গতিম্॥

'হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, এমনকি যাহারা পাপযোনিসম্ভূত অন্ত্যজ জাতি, তাহারাও আমার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া সেই পরম গতি লাভ করিবে।'

এখানে 'বৈশ্য ও শূদ্রগণ' বলিতে, আর্যসমাজভুক্ত চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে বাদ দিয়া নিম্নস্থ দুই বর্ণ বা শ্রেণীকে, 'পাপযোনি-সম্ভূত অন্ত্যজ জাতি' বলিতে, আর্যসমাজ-বহির্ভূত শূদ্রগণকে, এবং স্ত্রীলোক অর্থে, সকল শ্রেণীরই নারীগণকে বুঝিতে হয়। এবং এইভাবে দেখা যায়—যাহাদের সম্বন্ধে এদিন কৃষ্ণের এই আশ্বাসবাণী, উহারা কে বা কাহারা? না, সেই সকল ব্যক্তি যাহাদের সকলকেই একদিন বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাজেই, এই-যে শ্লোকটি, আধ্যাত্মিকতা বা পারমার্থিকতা অপেক্ষাও, ইহার সামাজিক তাৎপর্যকেই বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। এবং সেদিক হইতে এরূপ অনুমান বোধহয় অসঙ্গত নহে যে, ইতঃপূর্বে গৌতমবুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই স্বাধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে, প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সমাজে যে-প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, উহার পরিপেক্ষিতেই অনতিকালমধ্যে গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল।

(৭)

এবারে অন্যান্য কথার পরে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আসিয়া, পূর্বোক্ত ৩য় অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক শ্লোকটিরই আংশিক পুনরাবৃত্তি করিয়া যেরূপ বলিতে শুনা যায়—

> শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং॥

তাহাতে কি মনে আসিয়া যায় না যে, বৈদিক যুগের শেষে গীতা-পূর্ববর্তী কোনো এক সময়ে আর্যসমাজভুক্ত জনগণকে ব্যাপকভাবে নিজ-নিজ ধর্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করত ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়াই, গীতাকারকে পুনঃ পুনঃ এইভাবে এবং এত করিয়া পরধর্মের তুলনায় স্বধর্মের প্রশংসা করিতে হইয়াছিল? এই 'পরধর্ম্ম' বলিতেও কেন যে আমাদের মনে বৌদ্ধধর্মের কথাটাই উঠিয়াছিল, সে-বিষয়ে ইতঃপূর্বেই কিছু-কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। উহা ছাড়াও, প্রসঙ্গক্রমে, আর একটি কথাও স্মরণীয়—'গৌতম-বুদ্ধই ছিলেন পৃথিবীতে প্রচারশীল ধর্মের প্রথম [illegible], ধর্মান্তরিত-করণের [illegible] তাঁহার মতেই সর্বপ্রথম [illegible] ছিল। তিনি [illegible] এবং তাঁহার [illegible] অন্যান্য দেশকে তাঁহার ধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন।'

এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে, গীতার [illegible] নির্বাণ ও বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণবাদ' সম্বন্ধেও তুলনামূলকভাবে কিছু কথা আসিয়া পড়ে। তবে, গীতোক্ত 'ব্রহ্মনির্বাণ' বা সাম্যেস্থিতি ও বৌদ্ধধর্মে 'নির্বাণ' বলিতে যে-ধারণা, উহা তত্ত্বতঃ এক ও অভিন্ন কিনা সে বিষয়ে কোনরূপ আলোচনার মধ্যে না গিয়াও, সাধারণভাবেই বলিতে পারা যায় যে, যেমন অর্জুনের বিষাদযোগ হইতেই গীতার সূত্রপাত এবং ব্রহ্মনির্বাণতত্ত্বে পৌঁছিয়াই বস্তুতঃ উহার পরিসমাপ্তি, অনুরূপভাবে মানুষের জন্ম দুঃখবোধ হইতেই বৌদ্ধধর্মেরও উৎপত্তি এবং নির্বাণলাভে দুঃখের হাত হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তিই উহার চরম ও পরম লক্ষ্য। কাজেই এইভাবে রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে যে-অভিন্নতা দেখা যায়, উহা ভিন্নও উভয় ক্ষেত্রেই রোগমুক্তির জন্য দেওয়া

হইয়াছে যে-মহৌষধিটির ব্যবস্থা (উহার রূপটি যেমনই হোক্) নামের বেলায় কিন্তু আদৌ কোনো গরমিল দেখা যায়না। গীতায় সংস্কৃত ভাষায় বলা হইয়াছে 'নির্বাণ' আর ধম্মপদে অসংস্কৃত পালিভাষায় বলা হইয়াছে 'নিব্বাণ'—বাহ্যদৃষ্টিতে ভাষার বা উচ্চারণের মধ্যেই যা তফাৎ! এরপরও কথা এই, বুদ্ধ প্রধানতঃ সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যেই ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, সাধারণের অনধিগম্য কোনরূপ দুরূহ তত্ত্ববিচারে তাঁহার অনীহাই দেখা যাইত; তিনি স্পষ্টতঃই বলিতেন 'আমি ঈশ্বরসম্বন্ধে তোমাদের বিভিন্ন মতবাদের কথা জানিতে চাহিনা। আত্মাসম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতবাদের বিচারেই বা প্রয়োজন কী? ভাল কাজ কর এবং [উহার ফলেই] ভাল হও। ইহাই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে, এবং সত্য বলিতে যাহাকিছু আছে উহাতেই পৌঁছাইয়া দিবে।' প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতের মধ্যে, সূক্ষ্মতম যে-ব্যোম, উহাকে বাদ দিয়া, বুদ্ধকে কেবলমাত্র প্রথমোক্ত চারিভূতেরই উল্লেখ করিতে শোনা যায়। কাহারও-কাহারও মতে (এবং কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না) নির্বাণের পরে নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের যে-গতি হয়, অজ্ঞ লোকের পক্ষে উহা ভীতিজনক হইবে বুঝিয়াই, বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলিতে চাহেন নাই। অন্যপক্ষে দেখা যায়, কৃষ্ণ ছিলেন বুদ্ধাপেক্ষা ভূয়োদর্শী এবং তাঁহার ভূমিকাও ছিল একটু অন্যরূপ। যুগসন্ধিক্ষণে পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে সকলের জন্যই যুগধর্মপ্রচার ও ধর্মসমন্বয়ই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতগণ ও বিদগ্ধ সাধকগণের জন্যই যে উহার বিশেষ প্রচার, একথা বোধহয় অনস্বীকার্য। কাজেই সেদিক দিয়া দেখিলে, সেই একই নির্বাণ-তত্ত্বকেই যদি অধিকারী অর্থাৎ স্থানকাল-পাত্রভেদে, কোথায়ও উহার নেতিবাচক বা নঞর্থক, কোথায়ও-বা ইতিবাচক বা সদর্থক ভাবের উপর গুরুত্ব দিয়া বর্ণিত হইতে দেখা যায় (কিংবা সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও স্থানবিশেষে বক্তা নিরুত্তর থাকিয়া গিয়া থাকেন) তাহাতে আর বিস্ময়ের তেমন কি থাকিতে পারে? তবে সে-সব কথা ছাড়িয়া দিয়া, এখনকার

বক্তব্য এই যে, স্বরূপতঃ যেমন বা যাহাই হোক্ না কেন, এবিষয়ে বোধহয় কোনরূপ মতভেদ থাকিতে পারেনা যে, আলোচ্য নির্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার যে-ব্যাখ্যা বা বর্ণনা, উহা অধিকতর সমৃদ্ধ, সুদূরপ্রসারী এবং পূর্ববর্তী যে-কোন রচনা বা বর্ণনারই অন্ত্য-পরিণতি (Culminating point) বলিয়াই ধরিয়া লইবার যোগ্য।

ইহা ভিন্ন, 'কার্য-কারণ সম্বন্ধের' কথাতেও বলিতে হয়, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে যে 'পঞ্চ কারণের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে দৈব, পুরুষাকার, কর্মফল প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রের যাবতীয় আলোচনারই চূড়ান্ত ফল, পরিণতি বা সমন্বয় বলিয়াই মনে করিতে হয়।

(৮)

এই প্রসাঙ্গে অন্য একটি ব্যাপারকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মের যে মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়, অর্থাৎ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাসহায়ে নির্বাণলাভ, উহা প্রধানতঃ কর্ম, ধ্যান ও জ্ঞানযোগসাধনমূলক; অন্যপক্ষে গীতায় সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম, ধ্যান ও জ্ঞানের কথা ভিন্নও, পরবর্তী কালে উদ্ভূত ভক্তিযোগ বা ভক্তিমার্গ সম্বন্ধেও বহু কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

তবে, এইভাবে এখানে বুদ্ধের গীতা-পূর্ববর্তিতার প্রশ্নে, যে-ব্যাপারটি আমাদের বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, উহা হইতেছে—হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমালোচনা করিতে গিয়া বুদ্ধকে কথাচ্ছলে সর্বত্রই কেবল সগুণ ব্রহ্ম বা নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কথাই বলিতে শুনা যায়। তাহার কথার মধ্যে কোনরূপ মূর্তিপূজা বা মানবাকারে ঈশ্বরের রূপকল্পনা (Anthropomorphism) সম্বন্ধে কোথায়ও কোনো উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না; এবং বলিতে গেলে বলিতে হয়, থাকাও সম্ভবপর নহে। কেননা, আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীতে আসিয়া (অর্থাৎ বুদ্ধের আবির্ভাবের কমপক্ষে একশত বৎসর পরে) ব্যাকরণকার পাণিনী ও ঋষি পতঞ্জলির সময় হইতেই বস্তুতঃ

ভারতে দেবদেবীর মূর্তিগঠনের সূত্রপাত হয় (৪)। ইহার পর মানবাকারে ঈশ্বরের রূপ-কল্পনা সম্বন্ধে সহজেই মনে হয়, এইভাবে নানা দেবদেবীর মূর্তি গঠিত হইতে-হইতেই ক্রমে একদিন সর্বেশ্বর ঈশ্বরকেও মানবাকারে রূপদানের চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং উহারই চরম পরিণতিতেই গীতায় অবতারবাদের উৎপত্তি। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে, যে-কালেই গীতা রচিত হইয়া থাকুক না কেন, বুদ্ধের গীতা-পূর্ববর্তিতা সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে কী ?

(৯)

গীতার পরে, মহাভারতের অন্যান্য অংশেও এইকালে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে গুরুতর ভাবপরিবর্তনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (পূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা ভিন্নও) মহাভারতের উপাখ্যানভাগে বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরের যে-সকল পুরাকাহিনী, উদাহরণ যজ্ঞাদি ও সেই উপলক্ষে যজ্ঞে পশুবধ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ, পাওয়া যায় (৫) উহার সহিত তুলনীয়—পরবর্তী কালে, [illegible] করুণা

(৪) It is now the generally accepted view that the worship of idols among the Hindus is as old as Panini (500-450 B.C.)—2500 years of Buddhism : Later Modifications.

The first undoubted historical reference to image worship by an Aryan Tribe occurs in a passage of Curtius, which states that an image of Herakles was carried in front of Paurava Army as it advanced against Alexandar. Patanjali refers to exhibition and sale of images of Siva, Skanda, Vishakha by Mauryas who rose to power at the end of the period. Adva-nced History of India by Dr. R. C. Majumdar & others.

(৫) উল্লেখ্য রাজা রন্তিদেবের কাহিনীটি যাহাতে বলা হইয়াছে—তিনি অগ্নিহোত্রযজ্ঞে এত পশু বলি দিয়াছিলেন যে, তাহাদের রক্তে এক মহানদীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

ধর্মের প্রশ্নোত্তরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যেমন বলিতে শুনা যায়—'আনৃশংস্য অর্থাৎ (কায়মনোবাক্যে) অহিংসাই, পরম ধর্ম' কিংবা আরও পরে পরীক্ষিতপুত্র রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে তাঁহার প্রতি ঋষি বৈশম্পায়নের উক্তিটি—'হে মহারাজ! যজ্ঞই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্বকরা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে। অসংখ্য মহর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান (ও সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও জীবহিংসা) না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন' —ইত্যাদি।

কাজেই, এরূপ পরিস্থিতিতে কী আবারও একবার মনে আসিয়া যায় না যে, এই উভয়কালের মধ্যবর্তী কোন এক সময়েই গৌতমবুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল এবং তৎকর্তৃক প্রচারিত ধর্মে যজ্ঞার্থে পশুবধের নিন্দা, ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যলোপ, ও অন্যান্য নৈতিক বিধি-বিধানই ধীরে-ধীরে হিন্দুধর্ম ও সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কালক্রমে ধর্মকর্ম বিষয়ে এরূপ আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল? এইপ্রসঙ্গে, বৌদ্ধ ধম্মপদের ক্রোধবগ্‌গো ও মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে উদ্‌ধৃত নিম্নের শ্লোক দুইটির অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষণীয় (৬)।

কেবল মহাভারতেই নহে, উহার সমসাময়িক বা পরবর্তী কালে রচিত অন্যান্য পুরাণগ্রন্থেও এরূপ ভাবাদর্শ-পরিবর্তনের দৃষ্টান্তের আদৌ কোনো অভাব দেখা যায়না। এই প্রসঙ্গে, বুদ্ধের পুরাণ-পূর্ববর্তিতার অনুকূলে অন্য একটি ব্যাপারেও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, বেদেও যেমন নরকের কোন উল্লেখ নাই, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রেও সেইরূপ নরকে শাস্তিভোগের কোনো প্রসঙ্গ কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। অন্যপক্ষে, পরবর্তিকালে আসিয়া যেদিক দিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়াই হোক্, পুরাণকারগণকে কিন্তু নানাপ্রকার নরকের উল্লেখ ও সে-সকলে কঠিন শাস্তিভোগের বিশদ বর্ণনাও করিতে শুনা যায়।

(৬) অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।—ধম্মপদ
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।—মহাভারত

(১০)

গীতা ও মহাভারতের পরে, এবারে বৌদ্ধ ধম্মপদাদি হইতে আরও দুই একটি কথা লইয়া কিছু-একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। আমাদের প্রথমের যে-বক্তব্যটি, উহাকেই এখন ঘুরাইয়া লইয়া বলিতে হয়,—যদি মহাভারত বা গীতা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ-পূর্ববর্তীই হইত, তাহা হইলে ধম্মপদাদি বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে অনুরূপভাবেই কোথায়ও-না কোথায়ও সে-সবের কিছু-একটু আভাস অবশ্যই পাওয়া যাইত। কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও, এরূপ কোনো নিদর্শন কোথায়ও পাওয়া যায় কী? ধম্মপদাদিতে 'মঘবা' (ইন্দ্র) প্রমুখ যে-সকল দেবতা, ও বিশ্বামিত্রপুত্র অষ্টকাদি যে-সকল ঋষিদের নামোল্লেখ দেখা যায়, উহারা সকলেই ছিলেন আদিতে বৈদিক দেবতা বা ঋষি। কোনো পৌরাণিক দেবদেবীর, কিংবা গীতোক্ত বিশ্বরূপদর্শন বা উহার ন্যায় কোনো অলৌকিক পুরাণ-কাহিনীর নামগন্ধপর্যন্তও বৌদ্ধশাস্ত্রে কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেখা যায়, যখন সংসারত্যাগ করিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কোনো-একজন অভিজ্ঞ সাধু বা তত্ত্বজ্ঞের সন্ধানে পরিব্রাজক বেশে দেশে-দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তখন গীতার শ্লোকের ন্যায় কোনো-একটি শ্লোকও তাঁহার কর্ণ-গোচর হয় নাই, কিংবা যাঁহাকে গীতোক্ত জ্ঞানের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া বলিতে পারা যায়, এমন কোনো-একজন পুরুষেরও তিনি কোথায়ও দর্শন পান নাই। ঘুরিতে-ঘুরিতে ঋষি আরাড় কালামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তিনি কিছুদিন তাঁহার নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত-ভিত্তিক সাধনমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন, ও পরে উদ্রক-রামপুত্র মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছু সাধনভজনও করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায়ও ইপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া, অবশেষে নিজেই নিজের চেষ্টায় 'দুর্লভবোধিপ্রাপ্ত' হইবার চরম ও পরম সংকল্প গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

যাহা হোক, ধম্মপদের আলোচনাক্রমে উহার মধ্যে পকিণ্নকবগ্‌গে

যে-একটি অদ্ভুত শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, কেবল সে-সম্বন্ধেই এখন কিছু-একটু আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধটি শেষ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্লোকটি এইরূপ—মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে,
রট্‌ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।

বলিতে কী। নিতান্ত কষ্টকল্পনা সহায়েই, এখানে 'মাতরং' বলিতে 'তৃষ্ণাকে', 'পিতরং' বলিতে 'অহংকারকে', দুইজন ক্ষত্রিয়রাজা বলিতে তথাকথিত 'শাশ্বত দৃষ্টি' ও 'উচ্ছেদদৃষ্টি' এবং 'সানুচর রাষ্ট্র' অর্থে 'ইন্দ্রিয় ও বিষয়ানুরাগ' এরূপ ধরিয়া লইয়া, শ্লোকটির বঙ্গানুবাদে বলিতে শুনা যায়—'মাতাপিতা, দুইজন ক্ষত্রিয়রাজা, ও সেইসঙ্গে সানুচর রাষ্ট্রকে বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ পাপমুক্ত হন।' অন্যপক্ষে, আমাদের কিন্তু মনে হয়, আলোচ্য ধম্মপদেরই অন্যত্র বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট সমালোচনা করা হইয়াছে, উহার পরিপেক্ষিতে এখানেও শ্লোকটির এরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিতে না গিয়া, উহার সহজ-সরল ও স্বাভাবিক অর্থ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তবে সে-ক্ষেত্রে এটিকে তৎকালীন ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের প্রতি একটি কটাক্ষ বা শ্লেষোক্তি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইলে (যেমন কিনা, মাতা-পিতাকে হত্যা, বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বিনাশ, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রকে ধ্বংস ক'রে ফেলেও, ব্রাহ্মণ নিষ্পাপই থেকে যান।) উহার পশ্চাতে হিন্দুসমাজের অনুরূপ কোনো ঘটনা বা জন-শ্রুতির কোথায়ও কোনো উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ কোনকিছুর হদিস কোথায়ও পাওয়া যায় কি? একটু ভাবিয়া দেখিতে গিয়াই মনে পড়িয়া যায়, হিন্দুপুরাণের অবতারখ্যাত ব্রাহ্মণকুমার পরশুরামকর্তৃক প্রথমজীবনে পিতার আজ্ঞায় মাতৃহত্যা, ব্রাহ্মণবধের প্রতিশোধ লইতে গিয়া ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গের বংশনাশ ও অবশেষে উহাদের রক্তে সৃষ্ট সমন্তপঞ্চক তীর্থে তর্পনের দ্বারা পরিশুদ্ধিলাভের বিখ্যাত পুরাকাহিনীটি। পরশুরাম বহুকাল জীবিত ছিলেন। রামায়ণের সময়ের বহুপূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষার কালপর্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপের

কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই একথা বলাই বাহুল্য যে, পরশুরামের অন্তর্ধানের পরে-পরেই তাঁহার সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত এইরূপ কোনো জনশ্রুতিকেই যদি ধর্মপদের আলোচ্য শ্লোকটির জনক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়, তবে উহাদ্বারা কেবল যে বুদ্ধের গীতাপূর্ববর্তিতাই সমর্থিত হয় তাহা নহে, উহার ফলে শ্লোকটির কোনরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যারও প্রয়োজন থাকেনা। তবে সে-ক্ষেত্রে, প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্যাপারটি যদি বস্তুতঃ এইরূপই হইত, তাহা হইলে কথাগুলিকে এভাবে বেনামী করিয়া বলিতে না গিয়া, প্রসঙ্গ-ক্রমে পরশুরামের নামোল্লেখ করা হইল না কেন? উত্তরে বলিতে হয়,—'কে বলিয়াছে' অথবা 'কাহার কথা বলা হইতেছে' উহা অপেক্ষা আলোচ্য বিষয়ের উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়াই ছিল সে-কালের রেওয়াজ। এবং সেইজন্যই বোধ হয়, এখানে অর্থাৎ বৌদ্ধ ধম্মপদের শ্লোকটিতে পরশুরামের কোনো নামোল্লেখ করা হয় নাই, এবং সম্ভবতঃ সেই একই কারণেই গীতায়ও কথাপ্রসঙ্গে কোথায়ও বুদ্ধ বা বৌদ্ধ-ধর্মের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

—(::)—

লেখকের অন্যান্য বই

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সর্বধর্ম-সমন্বয়

(তাত্ত্বিক পর্যালোচনা) পাঁচ টাকা

যুগান্তর ৮-৪-৮১···· 'ভাবনার বিত্তে চিত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তির এমন আলোচনা সম্প্রতি দেখা যায়না।'

রামচরিতমানসে (কাক-গরুড়কথা) চার টাকা

ডঃ অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য (সংস্কৃতবিভাগ-প্রধান, ডি. এ. কলেজ, গড়িয়া)—'রামচরিতমানসের এরূপ হার্দ্য জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ ইতঃপূর্বে আর কোথায়ও দেখিনি'।

মহাভারতের উপাখ্যান (তাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত)

পাঁচ টাকা

ডঃ এইচ. কে. দেচৌধুরী (ধর্মতত্ত্বাচার্য)—'আখ্যানগুলিতে মহাভারতের মূল ভাবধারা বহুলাংশে প্রতিফলিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠাগারগুলিতে এই গ্রন্থ সংরক্ষণীয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রঃ তাত্ত্বিক ও তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা

পাঁচ টাকা

ডঃ করুণাপদ দত্ত (বি. এ (অনার্স) এম. এ (প্রথম) এম. এ (প্রথম শ্রেণী) মেডালিষ্ট, পি, এইচ, ডি, প্রাক্তন অধ্যাপক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ ফেলো, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ সম্পাদক, ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

"গ্রন্থখানিতে প্রবীণ লেখক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টির আলোকের পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ধর্মীয় সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থখানি প্রণয়নে লেখককে যেরূপ কষ্টস্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা সত্য-সত্যই প্রশংসনীয়। কেবল বেদ-পুরাণ হইতেই নহে, ললিতবিস্তর ও সূত্র-পিটকাদি বৌদ্ধশাস্ত্র হইতেও তাঁহাকে মূল্যবান উপকরণ বা তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইতঃপূর্বেই তিনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া, ভাববস্তুর গাম্ভীর্য, বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং প্রতিপাদ্য বিষয়কে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টাদ্বারা সুধীসমাজে খ্যাতিলাভ

করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

বর্তমানক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কেননা, কৃষ্ণ আমাদের ইষ্ট বা আরাধ্যদেবতা; এবং তাঁহার প্রতিটি কার্যই আমাদের চোখে ঐশ্বরিক তাৎপর্যপূর্ণ ও মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির ঊর্ধ্বে। যুক্তির সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচারে কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ ভক্তিযোগের পরিপন্থী; এবং আদৌ সম্ভবপর কিনা সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এসম্বন্ধে বৈষ্ণবপদকর্তাদের উক্তি—'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।' এপথ রাগানুগা ভক্তির পথ, যে-পথে যুক্তিতর্কের—সূক্ষ্মতম বিচার-বিশ্লেষণের কোন স্থান নাই। যে কৃষ্ণচরিত্র নিজের আলোকেই আলোকিত, তাহাতে আর কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোকপাত করিয়া লাভ কি? অবশ্য নিজে লেখককেও এবিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানির ৪২ পৃষ্ঠায় 'ভক্ত্যামামাভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' এবং ৪৭নং পৃষ্ঠায় 'যাহা সাত্ত্বিকভাব বা রাজস বা তামস সকলই আমা হইতে জানিবে' প্রভৃতি গীতোক্ত ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতে শুনা যায় 'ভগবানকে অথবা (কৃষ্ণের ন্যায়) অবতারপুরুষকে জানিতে, বুঝিতে বা চিনিতে হইলে, কেবল যুক্তিবুদ্ধি বা জ্ঞানবিচারই যথেষ্ট নয়, সেইসঙ্গে প্রয়োজন হইয়া পড়ে ভক্তি বা পরাভক্তিরও'। সুতরাং এ বিষয়ে এতদতিরিক্ত কোন-কিছু বলিতে যাওয়া, কিংবা তুলনামূলকভাবে বুদ্ধ বা যীশু সম্বন্ধে কোন কথার অবতারণা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়; এবং সেজন্য অগণিত পাঠক-পাঠিকার তরফ হইতে লেখককে অজস্র সাধুবাদ জানাইয়া এখানেই আমার বক্তব্যটি শেষ করিতেছি।'

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যব্যবহার (২য় সঃ ফার্মা কে এল এম প্রকাশিত)

দশ টাকা

পরের বই—কথামৃতের কথা (১ম খণ্ড): শ্রীমকথিত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কালক্রমিক বিন্যাস ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

পরের বই—কথামৃতের কথা : ১ম খণ্ডের নমুনাস্বরূপে একদিনের কথার কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। ষড়বিংশ পর্ব : দক্ষিণেশ্বর মন্দির ২৪শে আগষ্ট ১৮৮২ গুরুশিষ্য সংবাদ : গুহ্যকথা : নিষ্কাম কর্মযোগ।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। মা কালী ও রাধাকান্তের মন্দিরে আলো জ্বালা হয়েছে। ঠাকুরের ঘরেও ধুনো দেওয়া হয়েছে; পিলসুজে একটি প্রদীপও জ্বলছে। বাইরে চারদিকে চাঁদের আলো।

একটু পরেই কালীবাড়ীতে আরতি শুরু হল। আরতি শেষ হ'তেই, নিজের ঘরে ছোট খাট্‌টিতে বসে মাষ্টারমশায়ের সাথে ঠাকুরের নানা কথা চলেছে। মাষ্টার নিচেয় মেজেতে বসে আছেন।

নিষ্কামকর্মের কথা। আবারও বিদ্যাসাগরমশায়ের কথা তুলে বলতে শুনা যায় ঠাকুরকে—"নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করবে"। চেষ্টা করবে কেন? না, ইচ্ছে থাকলেও নিষ্কামভাবে কাজ করা বড়ই কঠিন। এদিনের এইসব কথা ছাড়াও, অন্যান্য দিনেও এবিষয়ে আরও অনেক কথাই শুনা যায় ঠাকুরের মুখে। একদিকে যেমন শুনা যায়—"ঈশ্বরলাভ না হ'লে নিষ্কামকর্ম করা যায়না, অন্যদিকে তেমনি চিত্তশুদ্ধি (ও ওর ফলে ঈশ্বরলাভের জন্য) দিতে দেখা যায় তাঁকে নিষ্কামকর্মের বিধানও। আবার, এদুয়ের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য ক'রে বলা হ'য়েছে কথামৃত ১মভাগে —"জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নেই, একে নিষ্কামকর্ম বলে। এরূপ কর্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারেনা। বড় কঠিন। সকলকেই কর্ম করতে হবে; দু'একটি লোক কর্মত্যাগ করতে পারে। দু'একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কামকর্ম করতে-করতে রাজো মিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়।" এভাবে কর্ম করতে গেলেও, ওর ফলোদয় আছেই, কাজেই এরপর শুনা যায় কর্মফলত্যাগ বা ঈশ্বরে কর্মফলসমর্পণের কথাটাও।

এবারে মাষ্টারমশায়ের যে-প্রশ্নটি—'যেখানে কর্ম, সেখানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয়? হিন্দিতে

একটা কথা সেদিন পড়্‌লাম—'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম,'—ওটিকে বস্তুতঃ তুলসীদাসের যে-কথা তাথেকে একটু অন্যভাবের—জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের কথাই বলতে হয়। তুলসীদাসের দোঁহাটিতে 'কাম' অর্থে কর্ম না বুঝে, 'কামনা' বা বিষয়াসক্তিই বুঝতে হয়। যেখানে 'রাম' কিনা ঈশ্বর, সেখানে 'কাম' অর্থাৎ বিষয়াসক্তির স্থান নেই ; যেমন আলো আর অন্ধকার কখনও একসঙ্গে থাকৃতে পারেনা (তুহুঁ মিলত নহীঁ রব-রজনী একঠাম)। অন্যপক্ষে জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের ব্যাপারে দেখা যায়, সাংখ্যবাদীদের যে-মত—অর্থাৎ কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব পারিত্যাজ্য—ওটিকে খণ্ডন করেই গীতায় বলা হয়েছে—'হে অর্জুন! এইসকল কর্ম (যজ্ঞদানাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম) [সকল সাধকের পক্ষেই] অবশ্য কর্তব্য, কখনও ত্যাজ্য নহে। তবে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্খাশূন্য হয়েই এসকল করতে হয়। বস্তুতঃ কাম্যকর্মের ত্যাগই ত্যাগ, অন্যান্য কর্মের বেলায় ফলাকাঙ্ক্ষা বা কর্মফলত্যাগকেই ত্যাগ বলতে হয়। এছাড়াও দেখ, কর্ম না কর্‌লে তোমার দেহযাত্রাও অচল হ'য়ে পড়্‌বে।'

মাষ্টারমশায়ের প্রশ্নটির উত্তরেও এদিন অবিকল এইসব কথাই বলতে শুনা যায় ঠাকুরকেও—"কর্ম সকলেই করে [অর্থাৎ সাধকমাত্রকেই করতে হয়]। তাঁর নামগুণগান করা [অর্থাৎ ভক্তিমার্গে নবধা ভক্তি সাধনের ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়] এও কর্ম। (আবার) সোঽহং-বাদীদের 'আমিই সেই' এচিন্তাও [যেমন কিনা জ্ঞানবাদী বা আত্মবাদীরা করেন, তাও] কর্ম। (এমন কি) নিশ্বাসফেলা [জীবমাত্রকেই অহরহ যা করতে হয়] তাও কর্ম। (কাজেই) কর্মত্যাগ করবার যো নেই। তাই কর্ম করবে—কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।"....(অসমাপ্ত)।

(এইভাবেই, ৩০।৩২টি পর্বে ১ম খণ্ড (১৮৮২) সমাপ্য)।